গীতা-পরিচয়।

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।"

* * * *

শ্রীরামদয়াল মজুমদার
প্রণীত এবং

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ "উৎসব" কার্য্যালয় হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

মকর সংক্রান্তি শকাব্দা ১৮৩৫।

বঙ্গাব্দা ১৩২০।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুঃ

প্রথম সংস্করণে নিবেদন।

"গীতা-পরিচয়" স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু ইহা গ্রন্থকারের সম্পাদিত (যন্ত্রস্থ) সমগ্র "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" অংশ মাত্র।

গ্রন্থকার নিজ ধর্ম্ম-জীবনের উৎকর্ষ বিধান-কল্পে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার মহাজন-প্রদর্শিত যে সুপ্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনুভূত বিষয়গুলি দৃঢ় করিবার জন্য যে যে তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গীতা পূর্ব্বাধ্যায়রূপে গীতা উপদিষ্ট হইবার স্থান, কাল, পাত্র অবলম্বনে প্রাচীন সামাজিক ছবি ও আর্য্য জাতির আদর্শ-শিক্ষা, গীতা উত্তরাধ্যায়রূপে গীতোক্ত শব্দ সমূহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে ধর্ম্ম-জীবন গঠনোপযোগী অনুষ্ঠান সমূহের বিশদ বিবরণ, গীতার পাঠক্রম, অধ্যায়-নির্ঘণ্ট, মূল, অন্বয়, প্রধান প্রধান ভাষ্য অবলম্বনে সহজ সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের সংশয়-নিরাস, এক অধ্যায়ের সহিত অপর অধ্যায়ের সম্বন্ধ নির্ণয়, বর্ণমালা ক্রমে শ্লোক-নির্ঘণ্ট, ভগবান্ শঙ্কর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, রামানুজ ও শ্রীধরস্বামিকৃত সমগ্র পাঁচটী টীকা প্রভৃতি যাহা যাহা বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন—গ্রন্থকারের সেই হৃদয় রত্নগুলি আমরা "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম—"গীতা-পরিচয়" তাহারই অংশ মাত্র। ইতি—

বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দা }
শকাব্দা ১৮২৭ }

প্রকাশক।

স্বাত্মারামায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুঃ

দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন।

'গীতা-পরিচয় শ্রীগীতার অংশ মাত্র' আটবৎসর পূর্ব্বে গীতা-পরিচয় প্রথম প্রকাশ সময়ে ইহা বলা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তক দুই হাজার মুদ্রিত হয়। দুই তিন বৎসরেই এই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। যে কারণে এতদীর্ঘকাল ইহার পুনর্মুদ্রণ হয় নাই তাহা না বলাই ভাল।

শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্যান্য অংশগুলি এখানে ক্রম অনুসারে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম গীতা পূর্ব্বাধ্যায় বা ভারত-সমর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

২য় গীতাপরিচয়।

৩য় শ্রীগীতা প্রথম ষট্ক।

৪র্থ শ্রীগীতা দ্বিতীয় ষট্ক।

৫ম শ্রীগীতা তৃতীয় ষট্ক।

৬ষ্ঠ শ্রীগীতা মাহাত্ম্য ও

শ্রীগীতার শ্লোক ও শব্দ নির্ঘণ্ট।

পূর্ব্বে গীতা সম্বন্ধে যাহা যাহা আলোচনা করার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তাহা প্রায় শেষ করা হইয়াছে। কেবল গীতা উত্তরাধ্যায় এবং প্রধান প্রধান ভাষ্য ও টীকা এই দুই খানি পুস্তক শেষ করা হয় নাই। ভাষ্য ও টীকা পুস্তক স্বতন্ত্র প্রকাশ করা এখন অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। গীতা উত্তরাধ্যায় 'উৎসব'-নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ মাত্র হইয়াছিল। পুস্তক খানি বহুদূর পর্য্যন্ত লেখা হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ অবসর না মিলিলে এই পুস্তক শেষ করার সঙ্কল্প আর নাই।

ষষ্ঠখণ্ড খানি "উৎসব" পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। অল্পদিনেই শেষ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

গীতা পরিচয় গ্রন্থে 'গীতার আদর', 'গীতার রক্ষামন্ত্র', 'গীতায় জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম' এই তিনটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল। প্রথম সংস্করণের কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না। কেবল স্থানে স্থানে সরল করিবার জন্য পূর্ব্বের বিষয় গুলিই কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইল মাত্র। আর অধ্যায়গুলিও কথঞ্চিৎ নূতন ভাবে সজ্জিত করা গেল।

নানা কারণে পুস্তকের মূল্য এক টাকা করা হইল।

কলিকাতা।
শকাব্দা ১৮৩৫। বঙ্গাব্দা ১৩২০।
মকর সংক্রান্তি উত্তরায়ণ আরম্ভে।

শ্রীগ্রন্থকার

সূচীপত্র।

মঙ্গলাচরণ।

———:০:———

ওঁ

তৎ সৎ

———•———

শ্রীগণেশায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় অপণমস্তু।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

যিনি স্থায়ী আনন্দভাবে সর্ব্বদা না থাকিতে পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দিত হইতে চাহেন না তিনিই জীব। যিনি সর্ব্বদা গম্ভীর—যাঁহাকে পরমাত্মার সহিত মিলন ভিন্ন কিছুতেই সুখ দেওয়া যায় না তিনিই জীব। যিনি অনুতাপ করেন, তিনি জীব নহেন তিনি মন। যিনি বিষয় পাইয়া আনন্দ করেন, কর্ম্ম করিয়া আনন্দ করেন, যিনি এক দিন একটু ভগবান্‌কে ডাকিয়া আনন্দ করেন, আবার পরদিন ডাকিতে না পারিলে দুঃখিত হয়েন, তিনি জীব নহেন তিনি মন। যিনি দুঃখে অস্থির হয়েন তিনি জীব নহেন। জীবের নিকটে যে মন থাকে তাহাই জীব-সান্নিধ্যে থাকিয়া শক্তি লাভ করিয়া বহু রঙ্গ তুলিতেছে, সুখী দুঃখী হইতেছে, সাধন ভজন করিয়া আস্ফালন করিতেছে। জীব কিন্তু যিনি তিনি আপন অখণ্ড স্বরূপ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সুখী হন না সংসারের আর কিছুতেই যথার্থ দুঃখী ও হন না। হীন অবস্থায় আসিয়া বড় লোকে যেমন সমস্ত দেখে, সব সয়, জীবও তাই। অনেক সময়ে ইঁহাকে ধরাও যায় না কোথায় আছেন?

সদ্গুরু আনন্দ-ব্রহ্ম। আমি জীব, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। তুমি পরম সুখ-স্বরূপ, জীবকে প্রকৃত আনন্দ দানে তুমিই সমর্থ। তুমি কেবল। কেবল আনন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই। জ্ঞান-মূর্ত্তি তুমি,—সুষুপ্তির অজ্ঞানানন্দ তুমি নও. তুমি সজ্ঞানানন্দ। শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব তোমাতে নাই। তুমি গগন-সদৃশ সীমাশূন্য। শ্রুতি, 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তুমি এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'এক' বলিয়া তুমি স্বগত-ভেদ শূন্য, 'এক' বলিয়া তুমি স্বজাতীয়-ভেদ হীন, এবং 'অদ্বিতীয়' বলিয়া তুমি বিজাতীয়-ভেদ বর্জ্জিত। নিত্যবস্তু তুমিই,—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে একমাত্র তুমিই আছ,—যাহা সর্ব্বকালে থাকে না তাহা অনিত্য। তুমি নিতান্ত নির্ম্মল—অজ্ঞান-মল তোমাতে নাই। তুমি সর্ব্বদা অন্তরের ও বাহিরের

সকল চেষ্টার, সকল কার্য্যের দ্রষ্টা—সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষী তুমি! তুমি ভাবাতীত ও গুণাতীত। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" যিনি আপন মহিমায় মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিত সেই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি।

স্ফুরন্তি সীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

যে ব্রহ্ম হইতে আনন্দকণা আকাশে ও ভূমিতলে স্ফুরিত হইতেছে, সর্ব্ব জীবের জীবন, সেই আনন্দ-ব্রহ্মকে নমস্কার।

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষুঃ সূর্য্যস্তব প্রভো॥

ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং, স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব।
ঈশ! ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং, নমোঽস্তুভূয়োঽপি নমো নমস্তে

উৎসর্গ।

ওঙ্কারপিঞ্জরশুকীমুপনিষদুদ্যানকেলীকলকণ্ঠীম্।
আগমবিপিনময়ূরীং আর্য্যামন্তর্বিভাবয়ে গৌরীম্॥
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং রাম-রামাং মনোরমাম্।
নির্লিপ্তাং নির্গুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধসনাতনীম্॥

ওঙ্কার-পিঞ্জরে তুমি শুক-পক্ষিণী,—উপনিষদ্-উদ্যানে তুমি কেলী-কলকণ্ঠী, আগম-বিপিনে তুমি ময়ূরী,—তুমি আর্য্যা,—তুমি গৌরী, আমি মানসে তোমার ভাবনা করি। তুমি ব্রহ্মস্বরূপা, নির্লিপ্তা, নির্গুণ, নিত্যা, শুদ্ধসনাতনী। তুমি মনোরমা—তুমি রাম-রামা—এ আয়োজন তোমার জন্য। তুমি সর্ব্ববেদে প্রণব, তুমি ওঙ্কার-বীজাক্ষরী, তুমি মহাবাশিষ্ঠ-রামায়ণে রাম-বশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন তুমিই। শ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বর তোমার সচ্চিদানন্দগঠিত মূর্ত্তি—রাজগুহ্য ব্রহ্ম-বিদ্যা তোমার স্বরূপাভাস—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-ক্রিয়া তোমার তটস্থ-ভ্রূভঙ্গী,—বাক্য তোমার রূপগুণ প্রকাশে অসমর্থ। লীলা তোমার অনন্ত! তুমি সর্ব্বদেবদেবী-অলঙ্কৃত—কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি ভাবে তুমি সর্ব্বত্র প্রপূজিত। তুমি মায়ামানুষ—তুমি মায়ামানুষী। গীতাবস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিত উপনিষদ্দেবী তুমিই—চন্দ্রার্কাগ্নি-সমানকুণ্ডলধরী গায়ত্রীদেবী তুমিই।

হে গুরো! হে মহাদেব-আলিঙ্গিত মহাদেবি! হে সর্ব্বনরনারী-বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তে! এই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-স্তবক তুমিই—উৎসর্গও তোমাকেই করা হইল।

তোমায় ভুলিয়া মানবের তৃপ্তির জন্য যেন আমার কোন অনুষ্ঠান না হয়। কায়মনো-বাক্যোত্থিত আমার ভূমি-বিলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম যেন তোমার বিশ্বরূপ-ঘনীভূত শ্রীমূর্ত্তি-চরণে নিরন্তর লগ্ন থাকে। তোমার তৃপ্তির জন্য সমস্ত লৌকিক-কর্ম্ম অবসানে তোমার 'সর্ব্বজীবে নারায়ণ-অনুভূতি'-রূপ উপাসনা শেষে যেন আমি তোমায় জানিয়া তোমার সঙ্গে নিরন্তর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারি।

আর যোগভক্তিজ্ঞানের কণ্ঠমালা ধারণ করিয়া তোমার জগৎ যেন তোমার চরণতলে চির-বিশ্রান্তি লাভ করে। অলমতিবিস্তরেণ॥

নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিত-ধ্বংসন-পটুঃ,
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপিরমাকান্ত ত ইয়ম্।
তব প্রীত্যৈ ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো,
কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তু ভগবন্॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষ-শ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

গীতা-পরিচয়।

প্রথম কথা।

গীতার আদর।

শ্রীগীতার আদর আজ জগত জুড়িয়া। সমস্ত সভ্য ভাষায় গীতা অনূদিত। এই গীতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিতেছি।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" যাহারা যে প্রয়োজনে আমাকে আশ্রয় করে, তাহাদিগকে সেই ফলদানেই আমি অনুগ্রহ করি।

স্বাধ্যায়সম্পন্ন সাধক যেমন যেমন শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ সাধনা দ্বারা এই বেদত্রয়ী তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী মুক্তিগেহিনীর আশ্রয়ে আগমন করেন, তিনি ততই যেন ইঁহার অনুগ্রহ অনুভব করেন।

শ্রীগীতা একবার অধ্যয়ন কর, মনে হইবে যেন ইহাতে কত কি আছে, যেন কত কি ইনি দেখাইবেন আশ্বাস দিতেছেন; আবার পড়, নূতন সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইল; আরও পড়, আরও রমণীয়; মনে হয় যেন ইহার শেষ নাই।

শ্রীগীতা ব্রহ্মস্বরূপিণী। শ্রীগীতা জ্ঞানময়ী। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার ভক্তের যে কোন ভক্ত যে ভাবে ইঁহার ভজনা করেন, ইনি সেই ভাবের মধ্য দিয়াই যেন ইঁহার আশ্রিতকে—এই কোলাহলময় জগতের অন্তস্তলে যে এক রমণীয় নিস্তব্ধ ভাবজগৎ আছে, প্রতি গতির অভ্যন্তরে যে এক পরমশান্ত স্থিতি আছে—ধীরে ধীরে শত সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে সেই স্থানে লইয়া যান।

শ্রীগীতা আনন্দময়ী। সাধনা দ্বারা ব্যাকুল হইয়া যে কেহ ইহার রূপ

দেখিতে উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত হয়েন, ইনি যেন ইঁহার আশ্রিতকে আপনার স্থূল স্থূল আবরণ উন্মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, আপনার যথার্থ স্বরূপ যে সেই রমণীয় দর্শন, তাঁহাকেই দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

শ্রীগীতা রঙ্গময়ী। জগৎস্বরূপিণী বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার অনুসরণ করা যেমন কঠিন, শ্রীগীতার অনুসরণ করাও যেন সেইরূপ দুরূহ। ভদ্রার সারথ্য-নৈপুণ্যে অর্জ্জুনের রথগতির মত, এই বিশ্বনর্ত্তকী, কখন জনমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করেন, পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া যান; মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলার মত কখন ইনি শূন্যে চমকাইতেছেন, কখন মেঘ মধ্যে লুক্কাইত হইতেছেন; সুদীর্ঘ জলাশয়ে বৃহৎ মৎস্যের মত কখন নিকটের জল আলোড়িত করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার দূরে চলিয়া গিয়াছেন; কখন মনে হইল বুঝি ধরিলাম, পরক্ষণেই কোথায় চলিয়া গেল—শ্রীগীতার পশ্চাদ্ধাবন যেন এইরূপ বিস্ময়কর।

জগৎস্বরূপিণী মায়ার চাঞ্চল্যাভ্যন্তরে যেমন স্থির শান্ত রমণীয় দর্শন বিরাজ করেন, শ্রীগীতাবস্ত্রান্তর্গুপ্তিত-স্তনী উপনিষদ্ দেবীও যেন এই খানে সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন। অধিক কি বলা যাইবে, মহাকাশ, চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ ছাইয়া শ্রীগীতার রূপরাশি ত্রিজগৎ চমৎকৃত করিতেছে।

যিনি সমকালে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, যিনি সমকালে পরমাশ্চর্য্যরূপ-ধারিণী মায়ামানুষী, সর্ব্বনরনারীবিজড়িত সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমসম্মিলিত বিশ্বরূপিণী, আবার আপন সৃষ্টি আপনি বিনাশ করিয়া, দৃশ্যগরল আপনি নিঃশেষে পান করিয়া, দৃশ্য-প্রপঞ্চ আপন আত্মায় নিঃশেষে পরিপাক করিয়া, যিনি আপনাতে আপনি,—তাঁহার সমগ্ররূপ দর্শন যে আমাদের মত ক্ষীণপুণ্য, সাধন-কাতর দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সুদূরপরাহত, ইহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে?

গীতা অধ্যয়ন এক জীবনের কেন, যতদিন না জীবন্মুক্তি লাভ হয়, যেন তত জীবনের কার্য্য। জীবন্মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝি ইহার ভাব—ইহার স্থায়ীভাব—জীব-চৈতন্য বিন্দুকে, ব্রহ্ম-চৈতন্য সিন্ধুতে মগ্ন করিয়া রাখে না।

মনে হয় দ্বিতীয় বারের আলোচনায় শ্রীগীতা আরও একটু উজ্জ্বল ভাবে আসিয়াছেন। এমন কতবার হইতে পারে, কে বলিবে?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীগীতার অনুগ্রহ ভিন্ন শ্রীগীতা বুঝিতে বুঝি পারা যায় না।

যদি কাহারও শরণাপন্ন হওয়া যায়, তবে আশ্রিতকে আশ্রয়দাতার ইচ্ছা

অনুসারে চলিতে হয়; নতুবা আশ্রয় গ্রহণটা মৌখিক। যদি শ্রীগীতার আশ্রয় লইতে হয়, তবে শ্রীগীতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ অনুভব করিতে হইলেও, তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

কোথায় তাঁহার আজ্ঞা পাওয়া যাইবে যদি জিজ্ঞাসা করাযায়, তবে বলিতে হয়, বেদে পাওয়া যায়; অধ্যাত্মশাস্ত্রমাত্রেই পাওয়া যায়। গীতার মত পুস্তকে বিশেষরূপে পাওয়া যায়।

গীতা-শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানের আজ্ঞাগুলি বাছিয়া লইয়া যিনি যেটি পালন করিতে পারেন তজ্জন্য প্রাণপণ করুন; শ্রীগীতার অনুগ্রহ যে বুঝিতে পারিবেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গীতাগ্রন্থকে মানুষের মত জীবন্ত মনে করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অনেকে মনে ভাবিতে পারেন ইহা কি প্রকার ভক্তি? পুস্তক আবার মানুষের মত কিরূপে হইবে? আবার কেহ কেহ ইহা সত্যও ভাবিতে পারেন। "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। যাহা শ্রীভগবানের হৃদয় তাহা জড় বলিয়া নাই ভাবা হইল—ইহাতে কি কিছু অতিরঞ্জিত আছে? মানুষের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়; এইগুলিকে মানুষ বলা হয় না। স্থূল আবরণগুলিকে জীবন্ত করিয়া যে চৈতন্য পুরুষ বিরাজিত, তিনিই মানুষ।

জড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। গীতা-গ্রন্থের অক্ষরগুলিকে শব্দমাত্র বলা হইলেও সেই শব্দরাশির অর্থ দ্বারা যে আত্মদেব প্রকাশিত তিনিই শ্রীগীতা। ইনিই সমকালে অক্ষর বা অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ,ইনিই মায়ামানুষ বা মায়া-মানুষী,ইনিই প্রতি জীবের আত্মা। জড় আবরণটি মায়া, ভিতরের হৃদয়টিই আত্মদেব বা আত্মদেবী।

এই আত্মদেব বা আত্মদেবীর নাম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন :—

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥
ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরো নিশ্চল-মানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাহন্তে পরমং পদম্॥

হে অর্জ্জুন! গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ইত্যাদি নাম যিনি নিশ্চল-চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি সর্ব্বদার জন্য জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন, এবং অন্তে পরম শান্ত নিশ্চল আনন্দস্বরূপ বিশ্বতৈজস-প্রাজ্ঞ এই ত্রিপাদের উর্দ্ধে যে পরম পদ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতিলাভ করেন।

সর্ব্বজ্ঞান-প্রয়োজিকা ধর্ম্মময়ী শ্রীগীতাকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমস্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার, গীতাই আমার অত্যুগ্র অব্যয়-জ্ঞান, গীতাই আমার রমণীয় বাসভবন, গীতাই আমার পরম পদ। অধিক কি গীতাই আমার পরম গুহ্য; গীতাই আমার পরম গুরু।

শ্রীভগবানের পরম গুরু যিনি তাঁহাকেও চৈতন্যময়ী বলিতে কি আপত্তি হইতে পারে?

শেষ কথা। "কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥" :—

যাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় কৃষ্ণই সম্যক্ জানেন, অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ ফল অবগত, ব্যাসদেব বা শুকদেব বা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বা জনক কিঞ্চিৎমাত্র জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে অকিঞ্চন এই ছার জীবে কি জানিবে? তথাপি কোন্ সংস্কারবশে এই অসাধ্যসাধনও ছাড়িতে দাও না, তাহা বুঝিব কিরূপে? জীব কি আপন ইচ্ছায় এইরূপ কার্য্য করে, অথবা তোমার ইচ্ছায় চালিত হইয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা কে বুঝাইয়া দিবে? অথবা বুঝিবারই প্রয়োজন কি?

হে অগতির গতি! যে দিক্ দিয়াই লইয়া যাও, হে আত্মদেব! আমাদের এই কর, যেন সকল কার্য্যে মানুষ তোমার অনুগ্রহ কামনা ভিন্ন অন্য কামনা না করে, যেন সমস্ত ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে তোমার আশ্রয়ে নিরন্তর থাকিতে পারে। জনন মরণে তুমি মাত্র আশ্রয় দাতা।

হে অধমজনের ত্রাণকর্ত্তা! হে পতিতপাবন! হে পাপীতাপীর আশ্রয়! হে ক্ষমাসার! হে আমার দেবতা, হে আমার প্রভু! কি আর বলিব, প্রার্থনা করিতেও জানি না। তথাপি এই বলি, ভৃঙ্গ যেমন কমল মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে আরাম পায়—তাপত্রিতয়-জ্বালামালাকুল আমরা যেন সর্ব্বদা এই জ্বালা অনুভব করিয়া, কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, তোমার পরমপদে, তোমার মধুর চরণকমলে, চিরস্থিতি লাভ করিতে পারি। হে অব্যক্ত-স্বরূপ! হে বিশ্বরূপ! হে স্বেচ্ছাধৃত-বিগ্রহ! তোমার এই ত্রিবিধ রূপ দর্শন করিব, এই উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে যেন নিরন্তর তোমাকে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, প্রভু ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় কথা।

গীতার স্থান, কাল ও পাত্র।

স্থান, কাল ও পাত্র কাব্য সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়া থাকে। গীতা কি কাব্য? যদিও গীতা ধর্ম্মগ্রন্থ, যদিও গীতা সর্ব্ব-উপনিষদের সার, যদিও গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, তথাপি ইহার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের সমৃদ্ধ উপাদান দৃষ্ট হয়। পূজনীয় গীতা-রহস্যকার বলেন—"কাব্যাংশে ভগবদ্গীতা ভূতলে অতুল। স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায়?"

প্রথমেই স্থান-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। গীতার উৎপত্তি-স্থান কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-ক্ষেত্র। স্বচক্ষে দেখিয়া আইস কি এক মহাশ্মশান এই কুরুক্ষেত্র! কি এক দুর্ব্বিষহ বিষাদগীতি এইস্থানে নিরন্তর গীত হইতেছে। আজিও এই কুরুক্ষেত্রের যেদিকে অবলোকন করিবে, সর্ব্বত্রই দেখিবে বিনাশচিহ্ন। প্রাচীন বৃক্ষ, প্রাচীন কুণ্ডতড়াগাদির কথা ছাড়িয়া দাও, নূতন যাহা কিছু হইতেছে, তাহাও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে না। সমর-ক্ষেত্রে যে সমস্ত লতাগুল্মাদি জন্মিয়াছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন রুধির হইতেই ইহারা উৎপন্ন। এই স্থানেই ভগবান্ পরশুরাম একবিংশ বার ক্ষত্রিয়শোণিতে পৃথিবীকে রুধিরাক্ত করিয়াছিলেন। যে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে তিনি পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, এখনও সেই পঞ্চহ্রদ পুরাকালের ইতিহাস প্রচার করিতেছে। এখনও সমন্তপঞ্চকে কত লোক প্রতিবৎসর স্নানার্থ গমন করে। কালপুরুষ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আজ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। সম্মুখে রণ-নদী—এই রণ-নদীর বর্ণনা সুন্দর!

> ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা জয়দ্রথ-জলা গান্ধার-নীলোৎপলা
> শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
> অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
> সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণ-নদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ॥

অত্যুচ্চ তটশালিনী সমরনদী দু'কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই খরস্রোতার জলে কোথাও প্রচণ্ড আবর্ত্ত, কোথাও ভয়ঙ্কর কুম্ভীর, কোথাও বা

সুন্দর নীলোৎপল! ভীষ্ম দ্রোণ ইহার তটভূমি, জয়দ্রথ ইহার জলরাশি, দুর্য্যোধন প্রচণ্ড আবর্ত্ত, শল্য কুম্ভীর, কৃপ বহনী-প্রবাহ, কর্ণ বেলাভূমি, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ঘোর মকর। পাণ্ডবদিগকে এই রণনদীর পরপারে যাইতে হইবে স্বয়ং কেশব ইহার কৈবর্ত্ত—কাণ্ডারী। সমষ্টি-ভাবে যে ভগবৎ-সাগরে এই রণ-নদী মিশিয়াছে, বিশ্বরূপ দেখাইবার সময়ে যাহা ভগবান্ ভক্তকে দেখাইয়াছেন, সেই ভগবান্ ব্যষ্টিভাবে পাণ্ডব-তরণীর কর্ণধাররূপে আজ আপন জলে আপনি ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। জীবপুঞ্জকে তাড়িত করিয়া এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম—কুরুক্ষেত্রের মত ভীষণ সমর-ক্ষেত্র আর কোথায়?

তাহার পর গীতার কাল? প্রবল ঝটিকার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কত শান্ত অনুভব কর! নারায়ণ বিনাশ-কামনায় সমবেত নরপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতেছেন—আপনবিকৃত অঙ্গ আপনি ছেদন করিবেন, তাই আপনাকে আপনি অবলোকন করিতেছেন। এখনই রুধির-স্রোত প্রবাহিত হইবে, সমবেত জনসঙ্ঘ বিনষ্ট হইবে, পৃথিবীর পাপভার দূর হইবে, ভারতরমণীর হাহাকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে। এখনও কিন্তু সসৈন্য সমবেত রাজন্যমণ্ডলী স্থির, এখনও পরস্পর বিধ্বংসকারী দুই মহাসমুদ্র স্তম্ভিত—মহাসমুদ্রে একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে না। বিদ্যুদ্-বজ্র-পরিপূরিত দুই প্রলয় মেঘ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছে। গভীর গর্জ্জনে এখনও পরস্পর পরস্পরের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। এখনও বিদ্যুদ্ বজ্রাঘাতের সহিত দুঃসহ বারিবর্ষণ আরম্ভ হয় নাই। প্রতি বীর-হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। অচিরে এই সমরাগ্নি সমস্ত জীবপুঞ্জ দগ্ধ করিবে। অচিরেই সমর প্রাঙ্গণ রুধিরাপ্লুত হইবে। রুধিরাপ্লুত কুরুক্ষেত্র প্রলয়কালে অনল-গোলক-বৎ পৃথিবী মত প্রতীয়মান হইবে। এই লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা উপদেশ সম্ভব কি অসম্ভব, ইহার বিচার পুস্তক মধ্যে করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা পাত্রের বিষয় আলোচনা করিব। ইহার আলোচনা বিশেষ ভাবেই করা উচিত। কারণ গীতার কাব্যাংশ মনন করিতে পারিলে—ভগবান্ ও অর্জ্জুনের ব্যবহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে—সহজেই লয়-বিপক্ষের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—সহজে চিত্তশুদ্ধিলাভ করা যায়।

আমরা প্রথমেই দেখি মন্যুময় মহারাজ দুর্য্যোধন রণসজ্জা করিয়া সসৈন্যে কুরুক্ষেত্র-মুখে সাজিয়া চলিলেন। সৈন্যসংখ্যা একাদশ-অক্ষৌহিণী।

জৈমিনি-ভারতে অক্ষৌহিণীর একটি সহজ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। দশসহস্র হস্তীর প্রত্যেকটি রক্ষা জন্য একশত করিয়া রথ, প্রত্যেক রথ রক্ষা জন্য একশত করিয়া অশ্ব, প্রত্যেক অশ্ব রক্ষা জন্য একশত করিয়া পদাতিক ইহাই অক্ষৌহিণীর স্থূল হিসাব। গোস্বামী তুলসী দাস তাঁহার রামায়ণে যে ভাবে অক্ষৌহিণীর গণনা করিয়াছেন তাহাই সূক্ষ্ম গণনা। এখানে ঐ গণনা সন্নিবেশিত করা হইল।

সংজ্ঞা	রথ	হস্তী	অশ্ব	পদাতি	সমষ্টি
পত্তি	১	১	৩	৫	১০
সেনামুখ	৩	৩	৯	১৫	৩০
গুল্ম	৯	৯	২৭	৪৫	৯০
গণ	২৭	২৭	৮১	১৩৫	২৭০
বাহিনী	৮১	৮১	২৪৩	৪০৫	৮১০
পৃতনা	২৪৩	২৪৩	৭২৯	১২১৫	২৪৩০
চমূ	৭২৯	৭২৯	২১৮৭	৩৬৪৫	৭২৯০
অনীকিনী	২১৮৭	২১৮৭	৬৫৬১	১০৯৩৫	২১৮৭০
অক্ষৌহিণী	২১৮৭০	২১৮৭০	৬৫৬১০	১০৯৩৫০	২১৮৭০০

আর যে মণ্ডলাকার স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ পঞ্চ-যোজন অর্থাৎ বিশ ক্রোশ। উপস্থিত সময়ে যে স্থান টুকুকে কুরুক্ষেত্র বলে, সে স্থানে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্কুলন হয় না সত্য, কিন্তু যাঁহারা মহাভারত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—পঞ্জাব প্রদেশের দূর দূরবর্ত্তী স্থান জুড়িয়া এই সৈন্য সামন্ত অবস্থান করিয়াছিল। আমরা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায়ে এই সমস্ত স্থান উল্লেখ করিয়াছি। আরও এক কথা—সমস্ত সৈন্য এককালে যুদ্ধ করে নাই, ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়ক আপন আপন সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমরাঙ্গনে আসিতেছিলেন, ইহাও মহাভারতে উল্লেখ আছে। যাহা হউক একাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ পশ্চিম

বিভাগে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন, আর পাণ্ডবেরা উত্তর-পূর্ব্বদিকে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন।

মনে মনে গীতার এই প্রথম দৃশ্য অঙ্কিত কর, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর। এই বিশাল কুরুক্ষেত্রে অগণিত কুরুসৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত, কোথাও আর স্থান নাই। দ্বাপর-যুগের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ এখানে পরিলক্ষিত হইতেছে; সঞ্জয় স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দিব্য-চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রকে তাহারই সংবাদ দিতেছিলেন, বলিতে-ছিলেন—রাজন্! ঐ দেখ, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও মহামানী রাজা দুর্য্যোধন রাজবেশে পদব্রজে আচার্য্যের নিকট গমন করিতেছেন। দ্রুত গমনে নানারত্ন-বিজড়িত শিরতাজ রাজমস্তকে কম্পিত হইতেছে। আজ পাণ্ডব-সৈন্য দেখিয়া নিজ মর্য্যাদা ভুলিয়াছেন, সেনাপতিকে না ডাকাইয়া নিজেই দৌড়িয়া যাইতেছেন। ঐ দেখ, রাজনীতি-কুশল মহারাজ নিজের ভীতি সঙ্গোপন করিয়া সংক্ষিপ্ত অথচ বহু-অর্থযুক্ত বাক্যে আচার্য্যকে অঙ্গুলি তুলিয়া পাণ্ডব-সৈন্য দেখাইতেছেন। বলিতেছেন, হে গুরো! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র-বিরচিত পাণ্ডব-চমূ কিরূপে সজ্জীকৃত হইয়াছে। গুরুর ক্রোধোদ্রেক করাই দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়াও গুরুর বধোপায় কৌশলে জানিয়া লইয়াছে। এক্ষণে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া বিনাশার্থ আসি-য়াছে আরও দেখুন, এই সৈন্যমধ্যে শূর, বাণক্ষেপকুশল, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য মহারথ যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, বীর্য্যবান্ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, এবং দৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। শস্ত্র-শাস্ত্র-প্রবীণ মহারথ, একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ, এতদ্ভিন্ন শত শত অতিরথ, লক্ষ লক্ষ রথী ও অর্দ্ধরথ রহিয়াছে

পাণ্ডব-সৈন্য দেখাইতে দেখাইতে দুর্য্যোধনের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ ভিতরে অন্যায় আছে। রাজা অন্তর্ভীতি আচ্ছাদন করিয়া আপনাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তখন আপন পক্ষের প্রধান প্রধান সেনানায়কদিগের নামো-ল্লেখ করিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার পক্ষেও আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা এবং রাজা জয়দ্রথ আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; ইহাঁরা সকলেই অস্ত্রধারী ও যুদ্ধবিশারদ। আমাদের সৈন্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক

রক্ষিত এবং অপর্য্যাপ্ত। আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া ভীষ্মকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ভীষ্ম যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন, তখন যেন অন্যদিক্ হইতে কোন শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে।

দুর্য্যোধন নানা কথা কহিলেন, কিন্তু আচার্য্য কোন কথার উত্তর দিলেন না। দূর হইতে পিতামহ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, দুর্য্যোধনের মনের অবস্থা বুঝিলেন। ভীষ্ম বহুদর্শী ও প্রবীণ। ভীষ্ম পিতামহ—দ্রোণ-অপেক্ষা আত্মজন। ভয়ভীত দুর্য্যোধনের উৎসাহ জন্য তিনি শঙ্খধ্বনি করিলেন, তখন শত শত শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ, প্রভৃতি রণবাদ্য একেবারে বাজিয়া উঠিল; তুমুল শব্দে আকাশ ও রণভূমি পরিপূরিত হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া এই দৃশ্য স্মরণ কর।

একবার দুটি চক্ষু উন্মীলন কর, আবার দেখ কি সুন্দর—দেখ শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথাসীন কৃষ্ণার্জ্জুন আপন আপন শঙ্খধ্বনি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের শঙ্খ নিনাদিত হইল। দ্রুপদাদি নরপতিগণ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন করিলেন। অতিভৈরব সেই শঙ্খধ্বনি পৃথিবী ও আকাশ তুমুল করিয়া তুলিল, এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

ক্রমে রণবাদ্য মন্দীভূত হইল, আবার সেই অগণিত সৈন্য, অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায়, অনুত্তরঙ্গ জলরাশির ন্যায় গম্ভীর হইল, গীতার দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বতন্ত্র অভিনয় অনুভব কর। উৎকট শঙ্খনিনাদে কেহই রণে ভঙ্গ দিল না, বরং স্পর্দ্ধাসহ দণ্ডায়মান রহিল। সমর-কেশরী অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ!

বারণাবতের ভীষণ কু-অভিসন্ধি, দ্যূতক্রীড়ার নৃশংস কপটাচার, দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণের দারুণ অপমান, অজ্ঞাতবাসের বিজাতীয় ক্লেশ সেই ক্রোধাগ্নিতে ফুৎকার দিতেছে। অর্জ্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়াছেন—অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন, সহসা অন্য বাসনা জাগিল।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥

অর্জ্জুন সমরার্থে অবস্থিত রাজন্য-বর্গকে দেখিতে চাহিলেন, হৃষীকেশকে বলিলেন হে অচ্যুত! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি যুদ্ধকামী, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী এই নরপতি সমূহকে নিরীক্ষণ করি, তাবৎকাল তুমি উভয়-সেনার মধ্যে রথ স্থাপন কর! শ্রীভগবান্ তাহাই করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রথ উভয়সেনার মধ্যস্থলে আনীত হইল। অর্জ্জুন দেখিতেছেন—আত্মীয়, স্বজন, পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর—সকলেই যুদ্ধার্থ সমবেত। সহসা মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল—ক্রোধ দূরে গেল, আসিল নির্ব্বেদ। এই অর্জ্জুন-চরিত্রে আমাদের প্রয়োজন। সত্যকথা, অর্জ্জুনের মত বাহুবল আমাদের নাই, অর্জ্জুনের মত শূরত্ব আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্জ্জুনের মত শাস্ত্র-মর্য্যাদা, অর্জ্জুনের মত গুরু-মর্য্যাদা, অর্জ্জুনের মত লোক-মর্য্যাদা আর আমরা দেখিতে পাই না। তথাপি যখন দেখি, এই মহান্ চরিত্র প্রবল উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যের নিষ্ঠরতা অনুভব করিয়া আমাদের মত চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন, যখন দেখি কর্ত্তব্যের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়া—শোক-মোহাচ্ছন্ন হইলে আমাদের যাহা হয়—অর্জ্জুনের তাহাই হইতেছে, তখন অর্জ্জুনকে আমাদের মত ভাবিয়া অর্জ্জুনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে আমরা প্রস্তুত হই। বড় ব্যগ্র হইয়া শুনিতে চাই, অর্জ্জুন কি বলিতেছেন? অর্জ্জুন বলিতেছেন—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মমগাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥

বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! হে কেশব! এই সমস্ত স্বজনকে যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, রোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে এবং ত্বক্ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিঘূর্ণিত হইতেছে, নানাপ্রকার অমঙ্গল দেখিতেছি—অর্জ্জুনের বিষাদ-শান্তির জন্য ভগবান্ ব্রাহ্মীস্থিতি উপদেশ প্রদান করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থে বলিতেছেন—"ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ, সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপে অবস্থানের নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি একই কথা। ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন শোকের চিরনিবৃত্তি হইতে পারে না। অন্য অন্য উপায়ে শোক দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু ক্ষণিক-নিবৃত্তি জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যাকুল নহেন। কারণ গুরু-কর্ত্তব্যপালনে লঘুকর্ত্তব্যের সুখ অবশ্যই লাভ হয়। আত্যন্তিক নিবৃত্তিই এক-

মাত্র প্রয়োজন। সাংখ্য-শাস্ত্রে এই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই লক্ষ্য, যোগশাস্ত্রে এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়—চিত্তবৃত্তি নিরোধ—করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান; বেদান্তে ইহারই জন্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মীস্থিতির স্বরূপ বুঝাইয়াছেন এবং বাকী অধ্যায়গুলি এই স্থিতি কিরূপে লাভ হইবে, তজ্জন্য সাধনার ক্রম দেখাইয়াছেন। আমরা অতিসংক্ষেপে গীতোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি বা মুক্তির আলোচনা করিব। গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ-যোগ, শেষ-অধ্যায়ে মোক্ষ যোগ।

যেখানে অর্জ্জুন দুঃখ করিতেছিলেন—আত্মীয়স্বজন মরিবে, সেইখানে ভগবান্ কোন প্রকার দুর্ব্বলতার উপদেশ দিলেন না। যাহা সত্য তাহাই বলিলেন। বলিলেন তুমি পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছ কিন্তু মূর্খের মত কার্য্য করিতেছ। তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ। ভীষ্ম দ্রোণাদীর দেহগুলিই কিছু ভীষ্ম দ্রোণ নহে। ইঁহাদের আত্মাই ইঁহারা। কিন্তু 'আত্মার মৃত্যু নাই'। এই সমস্ত ব্যক্তির "আত্মা" অজর অমর। ইঁহারা আত্মা নহে ইঁহারা দেহ এই দেহাত্মবোধ তুমি কেন করিতেছ? তোমার জানা উচিত আত্মা—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

জীবের আত্মা শরীর নষ্ট হইলেও মরে না। এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।

বালক যোদ্ধা প্রসিদ্ধ বীরপুরুষদিগের নিকট অস্ত্রপরীক্ষা দিতে গিয়া যেরূপ কম্পিত হয়, বালক বক্তা জগন্মান্য পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে প্রথম মুখ খুলিবার সময় যেরূপ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হয়, শুষ্ক-মুখে আপন হৃদয়ে যেরূপ গুরুতর ঘাত-প্রতিঘাত উপলব্ধি করে, অর্জ্জুনের ততোধিক হইতেছে, অথচ অর্জ্জুন বিশ্ব-বিজয়ী মহাপুরুষ। কিরাতরূপী ভগবান্ পিনাকপাণি এই অর্জ্জুনের পরাক্রমে পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

> ভো ভো ফাল্গুন! তুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণাঽপ্রতিমেন তে।
> শৌর্য্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ॥

হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মে বড়ই তুষ্ট হইলাম, ধৃতি ও শৌর্য্যে তোমার মত ক্ষত্রিয় আর নাই।

যখন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্ব্বে এই অর্জ্জুন বিরাট রাজকুমার উত্তরের

সারথ্য করিয়াছিলেন, যখন উত্তর ভীত হইয়া ক্লীব বৃহন্নলার ভীতি উৎপাদন জন্য পুনঃ পুনঃ কৌরবসৈন্য দেখাইতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্যাদি কুরুবীরগণের নামোল্লেখ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন—তুমি একাকী, কিরূপে এই প্রবল-পরাক্রম মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন যে অর্জ্জুন সগর্ব্বে বিরাট-পুত্রকে উত্তর করিয়াছিলেন—'উত্তর! যখন দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে লক্ষাধিক নরপতি আমায় আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আমি একা—কে তখন আমার সহায় হইয়াছিল? যখন কালান্তক যমতুল্য অগণিত নিবাতকবচগণের সহিত আমি যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কে তখন আমার সাহায্যার্থ আসিয়াছিল?' যে অর্জ্জুন ঐ সময়ে উত্তরকে সারথি করিয়া বহুবার ভীষ্ম দ্রোণাদি মহারথগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনাদির প্রাণসংহারে সমর্থ হইয়াও যিনি সম্মোহন-অস্ত্রে কৌরব-শত্রুদিগকে মূর্চ্ছিত মাত্র করিয়াছিলেন, প্রাণসংহার করেন নাই, সেই অর্জ্জুন আজ বলিতেছেন—

"ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।"

হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে—বলিতেছেন—

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং ভোগৈ র্জীবিতেন বা॥"

কৃষ্ণ! আমি রাজ্যও চাহিনা, ভোগও চাহি না, জীবনেও আমার প্রয়োজন নাই। অর্জ্জুন মহাপুরুষ। মহাপুরুষও সাধারণের মত কাতরোক্তি করেন—সাধারণে আশান্বিত হয়, অর্জ্জুনকে আপনাদের মত মনে করে। তথাপি অর্জ্জুনের সহিত সাধারণের কোন বিশেষ সাদৃশ্য নাই। অর্জ্জুন মহাপুরুষ, তাহারা কাপুরুষ। জীবন-সংগ্রামে ভীত হইয়া লোকে শতবার বলে "আর পারি না", "মৃত্যু হইলেই ভাল হয়"। অর্জ্জুন কিন্তু 'পারি না' বলিতেছেন না, বলিতেছেন 'যুদ্ধ করিব না' কারণ যুদ্ধ করা নিষ্ঠুরের কার্য্য, আমি নিষ্ঠুর হইতে চাহি না। ক্লেশের ভয়ে বা প্রাণের ভয়ে কিন্তু অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না, হইতেছেন করুণায়—পাছে অপরের জীবন নষ্ট হয় এই জন্য—কিরূপে গুরুকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিবেন, কিরূপে পিতামহকে অস্ত্রাঘাত করিবেন, এই জন্য। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথা অর্জ্জুন একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছেন। যে পিতামহের ক্রোড়দেশে উপবেশন করিয়া পিতৃহীন বালক

পিতামহকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিত, আর ভীষ্ম সজলনয়নে বালকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন, আজ যাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে বিনাশ করিব কিরূপে? অর্জ্জুন এই জন্য শোকে কাতর। যে আচার্য্য অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রধান করিবার জন্য অশ্বত্থামাকেও গোপন করিয়া অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন—যে আচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ না থাকে, এই জন্য একলব্যের নিকটে বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুকে প্রাণে বিনাশ করিতে হইবে—অর্জ্জুন কৃপা-পরবশ হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতেছেন। তুমি কি এই কৃপাবেশে আবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাক? তুমি কি মনে ভাব—এই ধন গ্রহণ করিবে না, কারণ তুমি গ্রহণ করিলে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর মনঃপীড়া হইবে, অতএব গ্রহণ করা উচিত নহে—ইহা কি লোকের উক্তি? তাই বলিতেছিলাম কিছু পার্থক্য আছে। অর্জ্জুনের বিষাদ অস্বাভাবিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবিনাশ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এ বিষাদের মূলে পাপ নাই, আছে গুরু বা আচার্য্য বিনাশ-ভয়! যাহা হউক এই বিশ্ববিজয়ী মহাপুরুষ আজ যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করিয়া দীন-ভাবে দণ্ডায়মান। যাঁহার সব্যসাচিত্বে দেবাসুরে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহস পাইত না, যিনি শৌর্য্যে সুরোন্মাদিনী উর্ব্বশীকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এই শূর—এই বীর আজ অস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়া আর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাতরে যোড়-করে দাঁড়াইয়াছেন; এই লোকক্ষয়কর সমর প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছে; যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আজ তিনি ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন; আর সর্ব্ব-লোক-মহেশ্বর, ভক্ত-তরণীর কর্ণ-ধার, দীনের বন্ধু, তাপিতের আশ্রয়, বিপন্নের মধুসূদন, এই কাতর জনের রথে সারথি!

এই পার্থ-সারথি কে? শ্রী-গীতা ইঁহার পরিচয় কতদূর দিবেন, আমরা এখানে তাহার আলোচনা অসঙ্গত মনে করি না।

গীতাশাস্ত্রে "ভগবান্ উবাচ" এই কথায় শ্রীকৃষ্ণকেই যে লক্ষ্য করা হই-য়াছে, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার, ইনি যে মায়া-মানুষ, ইনিই যে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং অসাধুদিগের বিনাশ সাধন করিয়া যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তাহাও গীতাশাস্ত্রে পাওয়া যায়। "শ্রীভগবানুবাচ"-তে পাওয়া যায়—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪-৬

এই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অজ—জন্মরহিত ; ইনিই আবার ভূতসমূহের ঈশ্বর ; ইনি আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন।

এই শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে,—যাঁহার জন্ম নাই, যিনি অব্যয় আত্মা, যিনি প্রাণিসমূহের ঈশ্বর, তিনিই তাঁহার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন এবং আত্মমায়া-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা এখন জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি অজ, তিনি কোন্ বস্তু ?

শ্রীগীতাতে জীবের আত্মাকেও অজ বলা হইয়াছে। এই জীবাত্মাই অবিনাশী, ইনিই অব্যয়, শরীরের বিনাশে ইঁহার বিনাশ হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

জীবের আত্মা যিনি, তিনি কোন কালে জন্মেনও না, মরেনও না। ইনি হইয়া আবার যান, ইহাও নহে ; অথবা না হইয়া আবার হন তাহাও নহে। হইয়া—জাত হইয়া তিরোভূত হওয়াকে লোকে মরিল বলিয়া বলে ; আবার 'অভূত্বা'—না হইয়া 'ভবিতা'—হওয়াকে লোকে জন্মান বলে] তাই বলা হইল আত্মার জনন মরণ নাই ; ইনি অজ ; ইনি নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ, ইনি শাশ্বত—সর্ব্বদা বর্ত্তমান ; ইনি পুরাণ—পুরা হইয়াও নব—সর্ব্বদা নূতন, অপূর্ব্ব ; শরীর হনন করিলেও ইনি হত হয়েন না।

যিনি অজ, যিনি অব্যয়, তাঁহার সম্বন্ধেই পুনরায় বলা হইতেছে—শস্ত্র ইঁহাকে কাটিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইঁহাকে পচাইতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য ; ইনি অদাহ্য ; ইনি অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব ; ইনি চিরদিন আছেন ; ইনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, চিন্তার অগোচর ; ইনি ষড়্‌বিধ-বিকার-শূন্য।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জীবাত্মাকেও সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী বলা হইল। জীবাত্মা যেমন অজ, অব্যয়, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মাও সেইরূপ। গীতা তবে দেখাইতেছেন—যিনি জীবাত্মা, তিনিই পরমাত্মা ! নতুবা উভয়েরই সর্ব্বগতত্ব,

সর্ব্বব্যাপিত্ব বিশেষণ কেন দিবেন? যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি একই; তিনি পূর্ণই। জীবাত্মাও পূর্ণ, আবার পরমাত্মাও পূর্ণ; তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ কি রহিল? ফলে, শ্রুতি যেমন জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ করেন না, শ্রুতি যেমন বলেন,—'উপাধিগত পার্থক্য থাকিলেও বস্তুটি এক, আকাশ এক হইলেও ঘট-পটের পার্থক্য আছে বলিয়া এক আকাশকেই ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা হয় মাত্র' সেইরূপ শ্রীগীতাও বলিতেছেন,—'আত্মা একটি হইলেও ইঁহাকেই কখন বলা হয় ব্রহ্ম, কখন ঈশ্বর, কখন জীব—এই ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে নির্দ্দেশ করা হয়।' যাঁহারা গীতাশাস্ত্র একটু মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই এ কথা সত্য বলিয়া বুঝিবেন। সেইজন্যই গীতাকে "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী" বলা হইয়াছে।

এখন আমাদিগকে বলিতে হইতেছে,—যিনি ভগবান্, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বা মায়া-মানুষ, তিনিই পরমাত্মা—তিনিই জীবাত্মা। "ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্" ইহাতেও বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণ আবার সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫-২৯

এই শ্লোকে মায়া-মানুষ শ্রীকৃষ্ণই যে কর্ত্তা ও দেবতারূপে যজ্ঞ ও তপস্যা-সমূহের ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর, সর্ব্ব জীবের সুহৃৎ—ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। 'অহমাত্মা গুড়াকেশ!' ১০-২০ শ্লোকে এই শ্রীকৃষ্ণই যে আত্মা—সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা, তাহাও বলা হইতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রে ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বদেহে ইনিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক ফলদাতা—অধিযজ্ঞ, ইহাও গীতা বলিতেছেন।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" (৯-৮) এই মায়ামানুষ শ্রীকৃষ্ণই অব্যক্তরূপে নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন—এই শ্লোকে বলা হইতেছে,—যিনি অব্যক্ত নিরাকার, তিনিই ব্যক্ত অবতার। আবার যখন বলিতেছেন,—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। (১০-৪২)

বিষ্টভ্য বিশেষতঃ স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বেদং কৃৎস্নং জগদেকাংশেনৈকাবয়বেনৈকপাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণেত্যেতৎ ইতি শঙ্করঃ। এই সমস্ত জগৎ আমি—আমার একাংশমাত্রে—একপাদে সর্ব্বভূতস্বরূপে ধারণ করিয়া আছি। শ্রুতি যে

বিশ্বরূপকে—সগুণব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি", শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সেই সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ বলিয়াও বলিতেছেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৪

গীতা এই শ্লোকের ভাবে দেখাইতেছেন শ্রুতির সহস্রশীর্ষা পুরুষও তিনি। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন যখন বলিতেছেন,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ১১-৫

তখন কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে যে, যে পুরুষ অক্ষর ও অক্ষরেরও অতীত পুরুষোত্তম, যে পুরুষ সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ বিশ্বরূপ, যে পুরুষ অব্যক্ত, অবিনাশী অবিজ্ঞাতস্বরূপ, অক্ষর ব্রহ্ম, যে পুরুষ দেহে দেহে অধিযজ্ঞ, ক্ষেত্রজ্ঞ সেই পুরুষই এই মায়া-মানুষ শ্রীকৃষ্ণ-অবতার।

যে পুরুষ আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই পুরুষই বলিতেছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥৭-৪

বলিতেছেন,—গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, অহং-তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব এবং অবিদ্যা,—আমার জড় প্রকৃতি এই অষ্ট ভাগে বিভাগপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্নও আমার আর এক চেতন প্রকৃতি আছে—তাহার দ্বারা আমি জগৎ ধারণ করিয়া আছি। এই মায়া-মানুষ, অবতার, শ্রীকৃষ্ণই জড় ও চেতন প্রকৃতির নায়ক। জড় ও চেতন প্রকৃতির সহিত তাঁহাকেই জানাই জ্ঞান—ইহাও তিনি বলিতেছেন।

বিষ্ণুর পরমপদ অর্থে সাধারণ অর্থ বাদে ইহাও অর্থ হয় যে, বিষ্ণুই পরমপদ। যেমন 'রাহোঃ শিরঃ' অর্থে রাহুই শির বুঝায়, কারণ শির ভিন্ন রাহুর অন্য অঙ্গ নাই; যেমন 'সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গঃ' অর্থে সবিতাই বরণীয় ভর্গ বুঝায়, সেইরূপ "অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং" ইহাতে যে তৎপদ আছে, সেই পরমপদই যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহাও "তদ্ধাম পরমং মম" ইহাতে বুঝা যায়।

আমরা শ্রীগীতা হইতেই দেখাইতেছিলাম—যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই আত্মা, তিনিই মায়ামানুষ-অব-

তার। যিনি পরমাত্মা, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্, তিনিই অবতার। সর্ব্বশাস্ত্রে এই সত্য বাক্যই দেখা যায়। তুমি যদি বল,—সাকার শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, নিরাকার ব্রহ্মটি তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ, যদি বল,—পরমাত্মাটি কখন জীবাত্মা হইতে পারেন না, যদি বল,—পরমব্রহ্মের কখন অবতার হইতে পারে না, তাহা হইলে আমরা বলিব,—তুমি সম্প্রদায় রক্ষার জন্য বেদ অমান্য করিতেছ। ইহা তোমার অসমসাহসিকতা মাত্র। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

উপস্থিত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান্? অবতার-বাদ কতদূর সম্ভব? অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কাহারও কি হইয়াছিল? জীবন্মুক্তি কি কথার কথা নহে? অধিকাংশ লোকেরই এই সন্দেহ। সন্দেহ হওয়াই উচিত। কর্ম্মশূন্য জ্ঞান আলোচনায় যদি ইহা না হয়, তবে এই যুগাধিপতির দোষ পড়িবে। সংযম অভ্যাস না করিলে, যোগ ধারণা করিতে না পারিলে, তপস্যা না করিলে—এক কথায় তন্ময়তা, একাগ্রতা এবং চিত্তশুদ্ধি আচরণ না করিলে, দিব্যচক্ষু, জীবন্মুক্তি, অবতার, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব।

আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার কি না? এখানেও আর একবার অবতার সম্বন্ধে গীতার মত যাহা, আমরা তাহাই বলিব।

গীতার চরিত্র তিনটি ;—(১) সঞ্জয়, (২) অর্জ্জুন, (৩) শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আপনাকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান্, আত্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এখানে দেখাইতেছি সঞ্জয় ও অর্জ্জুন যে নামে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন নামে মানুষ ভগবান্‌কে ডাকে না। সঞ্জয় বলিতেছেন, হৃষীকেশ (১।১৫,২০ ২৪) ২।৯,১০, মধুসূদন (২।১), ভগবান্ (সর্ব্বত্র) গোবিন্দ (২ ৯) হরি (১১।৯ ; ১৮।৭৭),কেশব (১১।৩৫ ; ১৮।৭৬),কৃষ্ণ (১১। ৩৫;১৮।৭৫,৭৮), মাধব (১।১৪),যোগেশ্বর (১১।৯;১৮।৭৫,৭৮),বাসুদেব (১১।৫০;১৮। ৭৪),আর অর্জ্জুন? ইনি শ্রীকৃষ্ণের সখা ; সখা হইয়াও বলিতেন,—অচ্যুত (১।২), কেশব (১।৩৩), মধুসূদন গোবিন্দ, জনার্দ্দন (১।৩৫), মাধব, বার্ষ্ণেয়, পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম (১১।১২), পরমধাম, পরমপবিত্র, শাশ্বত, পুরুষ,স্বপ্রকাশ, আদিদেব, অজ, সর্ব্বব্যাপক, বিভু, ভগবান্ (১০।১৪), ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতি (১০।১৫) ইত্যাদি। শ্রীভগবানের এই সমস্ত নামেই বিশ্বাস করিয়া লোকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে। শ্রীভগবান্ যে জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কোন মানুষের প্রকাশ

করিবার শক্তি নাই। যে বিশ্বরূপ তিনি ভক্তকে দেখাইতেছেন, তাহা কোন মানুষেই দেখাইতে পারে না। তিনি আপন মহিমা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—আমিই ভগবান। তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে শত নামে ডাকিতেছে, শত বার পরমাত্মা, বিভু, আত্মা বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি আছে, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা যাইবে? যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতে পারিল না, ভগবান্ তাহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়াও বলিতেছেন, তাহাদের গতি কি। ইহাতেও যদি লোকের বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাদের যাহা অভিরুচি, তাহাই করুক; ইহাতে ভগবানেরই বা কি ক্ষতি, আর তাঁহার ভক্তেরই বা কি অনিষ্ট হইতে পারে? অল্পবিশ্বাসী মনুষ্য এই সমস্ত সংশয়ের কথা শুনিয়া অল্প বিশ্বাসটুকুও পরিত্যাগ করিয়া অধঃপাতে না যায়, এই-জন্য লোককে সাবধান করা স্বভাবসিদ্ধ। লোকে অবতার বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ অবতার স্বীকার করিতেন। তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের সহিত অবতারের এই পার্থক্য দেখাইতেছেন যে, অবতার আত্মজ্ঞান লইয়া অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণ মনুষ্য অজ্ঞান লইয়াই জন্মে। অবতারের জন্ম ও কর্ম্ম কতক অংশে সাধারণ মনুষ্যের মত, কতক অংশে অলৌকিক। এই অলৌকিকত্ব আত্মজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব নহে। সিদ্ধ পুরুষের কার্য্যকলাপেও অনেক অলৌকিকত্ব দেখা যায়, আর ভগবানের কথা ত স্বতন্ত্র। অষ্টসিদ্ধি যাঁহার করায়ত্ত, যিনি যোগেশ্বর, তিনি ইচ্ছা করিলে না দেখাইতে পারেন কি? মনুষ্য নিয়মে বাধ্য, কিন্তু ভগবান্ কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন। জড়ই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মের অধীন কিরূপে হইবেন? তিনি আপন নিয়মমতে জগৎ চালাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রয়োজন পড়িলে তিনিও কি আপন নিয়ম আপনি অতিক্রম করিতে পারেন না? যিনি স্বাধীন, তাঁহার এ শক্তি থাকিবে না কেন? নতুবা স্বাধীনতার ত কোন অর্থ নাই। অবতারের কার্য্যেও ত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্নি সকলকে দগ্ধ করে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত প্রহ্লাদকে দগ্ধ করে নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তির কার্য্য না হওয়া, প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত। কিন্তু ভগবানের পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। ভগবানের স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি সর্ব্বকালে একরূপ আচরণ করেন কিনা, তাহা কে বলিবে? তিনি কখন মৎস্য, কখন কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইবেন—দুর্ব্বল অবিশ্বাসী অজ্ঞানান্ধ

মানবের হৃদয় যাহা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, তাহাই যে অসম্ভব, তাহাই যে প্রক্ষিপ্ত বা কাল্পনিক, ইহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই।

বলা হইতেছিল—,যখন অর্জ্জুন শোকমোহে আচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন—জ্ঞাতিবিনাশ অপেক্ষা নিজের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর ভাবিলেন, তখন সাধারণ মনুষ্য অর্জ্জুনের প্রশংসাই করিয়া থাকে, দোষ কিছুতেই দিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিন্দা করিলেন, অর্জ্জুনকে দুর্ব্বল-হৃদয় বলিলেন, অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিলেন। এ ক্ষেত্রে লোকে ভগবানের নিন্দাই করিবে। ইহাই লোকের অজ্ঞান। পরমাত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তা যাঁহারা স্বীকার করেন, সর্ব্বদর্শিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে জগতের উপকারার্থ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে না পারিলেও সর্ব্ব-দ্রষ্টা ভগবান্ ইহা বুঝিয়াছিলেন, একথা সকলকেই বলিতে হইবে। লোকের বিচারে যে কার্য্য নিষ্ঠুর, ভগবানের বিচারে তাহা নিষ্ঠুর নাও হইতে পারে। মানুষ দুই দশ জনের মঙ্গল গণনা করিতে পারে, কিন্তু যিনি ত্রিলোকের হিতাহিত বিচার করেন, তিনিই জানেন,—মনুষ্যের পূর্ণ কর্ত্তব্য কি জননীকে পুত্রহারা করা জন-সাধারণের মতে নিষ্ঠুরের কার্য্য; কিন্তু শ্রীভগবান্ যদি ইহা নিষ্ঠুরের কার্য্য বিবেচনা করিতেন, তবে কি কোন জননী কখন পুত্রহারা হইত? অর্জ্জুন মনে করিতেছিলেন—জ্ঞাতিবধ নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য; কিন্তু শ্রীভগবান্ দেখিতেছেন,—আপাতনিষ্ঠুর কার্য্য দ্বারাও আত্মার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। দেখিতেছিলেন,—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জীবের মঙ্গলই সাধিত হইবে। যিনি মঙ্গলময়, প্রকৃত মঙ্গল তিনিই জানেন, এজন্য তাঁহার কোন কার্য্যে অমঙ্গল থাকিতে পারে না। তিনি দয়াময়; প্রকৃত দয়া কি, তাহা তিনিই জানেন; তাঁহার কোনও কার্য্যে নির্দ্দয়তা থাকিতে পারে না। মানুষ অজ্ঞান, শরীরের অনিষ্ট হইলেই মনে করে—কার্য্যটি অমঙ্গলময়; কিন্তু আত্মজ্ঞানী, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার করেন আত্মার উর্দ্ধাধোগতি দেখিয়া। যে আত্মা যত দেহাভিমানী—যে আত্মা দেহে ও জগতে যত অহংজ্ঞান স্থাপন করিয়াছে—দেহাভিমান, সংসার-অভিমান, জগৎ অভিমান, যাহার যত অধিক, সেই তত অজ্ঞান—সেই তত শোক-মোহের দাস। শুধু অর্জ্জুনকে বিষাদগ্রস্ত দেখিয়াই শ্রীভগবান্ যে তত্ত্বোপদেশ দিতেছেন, তাহাই নহে; সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষাদগ্রস্তের প্রতি আত্মানাত্ম বিচার প্রথম উপদেশ। মোহগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকেও ভীষ্ম আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে বলিতেছেন। সাধারণ মনুষ্যের বিচারে বিষাদগ্রস্তের প্রতি আত্মতত্ত্ব উপদেশ"ধান ভানিতে মহীপালের গীত" বলিয়া মনে হইতে

পারে, কিন্তু ঋষিগণের বিচারে ইহাই এ অবস্থায় একমাত্র উপদেশের বিষয়। তুমি দুর্ব্বল হও বা সবল হও, তোমার জন্য আদর্শ বিকৃত হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ এইজন্য অর্জ্জুনকে সত্য তত্ত্ব জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাই পরোক্ষজ্ঞান। পরে যে উপায় দ্বারা তোমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে,তোমার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—সেই কার্য্য ক্রম-অনুসারে তোমাকে করান আবশ্যক। মৃত স্ত্রী বা মৃত-পুত্র বা মৃত পিতামাতার দেহ অগ্নিসাৎ করা তোমার চক্ষে বর্ব্বরতা, কিন্তু যাঁহারা জানেন, কোন্ কার্য্যদ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁহাদের চক্ষে ইহাতে নিষ্ঠুরতা কিছুই নাই, বরং একান্ত কর্ত্তব্য। শরীরের ক্লেশ কোন্ পদার্থ, কেন ইহা হয়, এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহের নাশকে নাশ বলেন না। গীতা এই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা যথাস্থানে গীতার উপদেশ বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অর্জ্জুনের অজ্ঞানতা দেখিয়া, যিনি নারায়ণ—তিনি বিপন্ন নরকে মোহমুক্ত করিতেছেন—পুরাতন শিক্ষার কাল-সঞ্চিত মোহান্ধকার দূর করিতেছেন—তাৎকালিক প্রাণশূন্য কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের আবর্জ্জনা দূর করিয়া জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন—সাধ্য ও সাধনার উজ্জ্বল আলোকে দশদিক্ আলোকিত করিয়া নিত্য পরমানন্দ রাজগুহ্য সনাতন রাজ্যের পরম রমণীয় পথগুলি ক্রম-অনুসারে উদ্ঘাটন করিতেছেন। বড় সুন্দর তাঁহার উপদেশ! বড় সুন্দর সেই উপদেষ্টার রূপ! সত্যই এই অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণে হর্ষ আইসে, আর এই অদ্ভুত রূপ চিন্তনে মুহুর্মুহুঃ আনন্দ লাভ হয়। রূপ-সম্বন্ধে ব্যাসদেব বলিতেছেন,—

নীলনীরদপ্রভ দিব্যাভরণভূষিত তেজঃপুঞ্জকলেবর—পরিধান পীতাম্বর। মাধব হেম-মণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি ধারণ করিয়াছেন—যেন উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচল। ত্রৈলোক্যমধ্যে এ রূপের তুলনা হয় না। আর তাঁহার গুণ? ভক্তমুখে গুণ শুনাই ভাল। রথী, সারথির রূপে গুণে উদ্ভাসিত; এস, ভক্তিভরে সারথি ও রথীকে প্রণাম করি, তুমিও কর।

তৃতীয় কথা।

গীতার বিশেষত্ব।

গীতার প্রথম বিশেষত্ব সাধ্য * বিষয়ে—দ্বিতীয় বিশেষত্ব সাধন বিষয়ে। জীব সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাণী সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব। আপাততঃ তাহাই আলোচিত হইতেছে। সাধনবিষয়ের বিশেষত্ব পরে আলোচনা করা যাইবে।

সর্ব্বশাস্ত্রেই শ্রীভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ, আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়; সাধনক্রমের ব্যাখ্যাও বহুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত উক্তি কোথাও অবতারের মুখ হইতে নিঃসৃত, কোথাও জীবন্মুক্তের, কোথাও ঋষিদিগের, কোথাও ভক্তের। আত্মা কি?—সংসার-আড়ম্বর কেন?—কি জন্য জীবের শোক তাপ?—কিরূপে জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইবে?—এক কথায়, কিরূপে জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে বহুশাস্ত্রে ইহার আলোচনা আছে। গীতাশাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ এ সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাণী অন্যান্য শাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকিলেও, আর কোন্ শাস্ত্রে এই আশ্বাস-বাণীর প্রাধান্য এত অধিক? সত্য কথা, যাহা বেদে নাই, তাহা কোন শাস্ত্রেই থাকিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বতত্ত্ব উল্লেখ করিয়াও, যে শাস্ত্র যে বিষয়ের প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহাই তাহার বিশেষত্ব।

কোন এক মানব-জীবনে কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এই সমস্তের কার্য্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদের মধ্যে যেটি প্রধান, তাহাই তাহার বিশেষত্ব। মহাপ্রভু যখন যে ভাব গ্রহণ করিতেন, তখন সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া যাইতেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, আমিই ব্রহ্ম, আমিই ঈশ্বর, আমিই জীবকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি, আমিই ক্রূরকে আসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি, আমিই দিব্য চক্ষু প্রদান করি, আমিই দুরাচারকে সাধু

* যাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে হয়, তিনিই সাধ্য। শ্রীগীতা কোথাও বলিতেছেন না—একটি নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি মাত্রই জীবের উপাস্য। সকল অবতার-মূর্ত্তি যাঁহার, সর্ব্বদেহে আত্মা-রূপে যিনি, এই বিশ্বরূপে যিনি, যিনি সমকালে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিই সাধ্য বস্তু। সকল অবতারই তিনি।

করি। কোথাও ব্রহ্ম-ভাবে বলিতেছেন,—"নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" কোথাও ঈশ্বর-ভাবে বলিতেছেন,—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। কোথাও বলিতেছেন,—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" (আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়া-বশতঃ প্রকাশিত হই)। আবার কোথাও বলিতেছেন,—"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" ৭।৪-৫। ইত্যাদি।

দেহ-শূন্য আত্মা কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন? সেইরূপ উপাধিশূন্য ব্রহ্মের তত্ত্ব কে প্রকাশ করিবে? নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সংবাদ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়,—"যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্। ন যত্র বাক্ প্রভবতি" এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে বেদ জানেন না, (দেবাঃ পাঠও আছে) মন ইঁহার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, বাক্যের সাধ্য কি, সে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে! তিনি অবাঙ্মনস-গোচর—অচিন্ত্য—অব্যক্ত—নির্গুণ! যিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে অধিক বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,—"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্। সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা, সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা" নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বিশেষণও দেওয়া যায় না। কিন্তু তিনি সৎ, তিনি চিৎস্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ ইহা বলায় দোষ হয় না। কারণ কোন কিছুই না থাকিলে আপনি আপনি যে স্থিতি তাহাই স্বরূপের লক্ষণ। যিনি নির্ব্বিশেষ, তিনিই মায়া আশ্রয়ে সবিশেষ হন বলিয়া শ্রুতি এক সঙ্গে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ করেন। যাহা হউক ইনি 'নিজ বোধরূপ' —এই পর্য্যন্ত বলাই সঙ্গত। এই সমকালে নির্ব্বিশেষ থাকিয়াও সবিশেষ ব্রহ্মই দ্রষ্টা, ইঁহাতে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ত্রসরেণুবৎ উঠিতেছে—লয় পাইতেছে। ইনি সর্ব্বসাক্ষী—ইনি অন্তর্যামী, এরূপ উক্তিও আছে। নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ-ইন্দ্রজাল উৎপন্ন হইতেছে, জীব আপন আপন কর্ম্মফলে ঊর্দ্ধাধোগতি ত লাভ করিতেছে—ইহা যে গীতা বলেন নাই, তাহা নহে। "ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" প্রভু লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল-সংযোগ সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে,—গীতা এ সংবাদ দিতেছেন; কিন্তু সবিশেষ-ব্রহ্ম আত্মমায়ায় ঈশ্বরভাব ধারণ করিয়া, নামরূপ গ্রহণ করিয়া, আপন তত্ত্ব, আপন জন্ম, আপন কর্ম্ম আপনি বুঝাইতেছেন, তাঁহার আশ্রিত জীবকে

আশা দিতেছেন,—"অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।" বলিতেছেন,—তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ কর,"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" বলিতেছেন,—'তুমি যদি নিতান্ত দুরাচার হও, তথাপি আমাকে ডাকিবার শক্তি তোমার আছে ; তুমি অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে ডাক', সাধু হইয়া যাইবে।" 'সংসার-চেষ্টা, পরিজন-পোষণ চেষ্টা যদি তোমায় আমার কর্ম্মে বাধা দেয়, মনে ভাব',আমায় বিশ্বাস কর, সর্ব্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া আমাকেই ডাকিতে থাক', আমিই তোমার যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিব। আমিই তোমার অর্জ্জন-রক্ষণের ভার লইয়াছি, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত হইয়া ভজনা করিতে থাক। ভগবানের এই আশ্বাস-বাণী আর কোথায় এত প্রবল-ভাবে জীব-হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়াছে? আর কোথায় এত প্রবল-ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, "মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, তুমি সত্যই আমাকে পাইবে? কোথায় শোনা যায়, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" ? এই সবিশেষ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বচিত্তগামী সগুণ ব্রহ্মের আপন মুখে আপন মূর্ত্তিগ্রহণ, আপন মুখে জীবকে উৎসাহ-প্রদান, আর কোথায় এরূপ ভাবে শুনিতে পাই? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। আসুরী-রাক্ষসীযোনির মনুষ্য হউক, কাহাকেও হতাশ করিতেছেন না। যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও তুমি পাপী হও "অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ" তথাপি ভগবান্ তোমায় আশ্বাসিতেছেন! তুমি স্ত্রীলোক হও, বৈশ্য হও, শূদ্র হও, ভগবান্ তোমাকে হতাশ করেন নাই—বলিতেছেন,—"তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।" পাপী তাপীর এমন বন্ধুর কথা, কাঙ্গালের এমন ঠাকুরের কথা, এমন ভাবে আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায়? যিনি এক দিকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভক্তের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, তিনিই আবার অন্য দিকে সখারূপে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,—"দেখ, আমি তোমারই আছি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তুমি-শূন্য জগতে আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না।" অভিমন্যু-বিনাশের পর শ্রীভগবান্ দারুককে বলিতেছেন,—"অনর্জ্জুনমিমং লোকং মুহূর্ত্তমপি দারুক। উদীক্ষিতুং ন শক্তোঽহং ভবিতা ন চ তৎ তথা॥ যস্তং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তং হ্নু স মামনু। ইতি সঙ্কল্প্যতাং বুদ্ধ্যা শরীরার্দ্ধং মমার্জ্জুনঃ॥ প্রতিজ্ঞা-পর্ব্ব" ৭৭।৩২ আবার এই মায়ামানুষই বলিতেছেন,—"মত্তঃ পরতরং

নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" তাই আমরা বলিতেছিলাম, অন্যান্য সংবাদ বাদ দিলেও, এই আশ্বাস-বাণীই গীতার বিশেষত্ব। আমরা গীতার কতকগুলি আশ্বাস-বাণী একত্র করিলাম, ইহা নিত্য-সেব্য :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২।৬-৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্॥ ১১।৮

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না; কিন্তু এমন মধুর বাণী আর কোথায়? যেখানে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"আমাকে যা-ই দাও, তাহাই আমি ভোজন

করিয়া থাকি; কিন্তু যাহা দিবে, ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিও।” ভক্তি করিবার সামর্থ্য পাপী, তাপী, সুদুরাচারী সকলেরই আছে; যদি সুদুরাচারও ভক্ত হইতে না পারিত,তবে কি ভগবান্ বলিতেন,—“অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্”? সুদুরাচার হইয়াও একান্তচিত্তে যদি কেহ আমাকে ডাকে ইত্যাদি ইহাতেই বুঝিতে হইবে, সুদুরাচার হইলেও একাগ্রচিত্তে ডাকিবার সামর্থ্য থাকে। নরের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল নারায়ণের আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া কাহার না সাধ হয় তাঁহাকে পূজা করি? নারায়ণ যে বলেন,

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

“আমাদের কাতরোক্তি, আমাদের কাতর প্রার্থনা, তিনি কি শুনিয়া থাকেন?”—এই-না অবিশ্বাসীর সন্দেহ? “আমি ভিখারী, তিনি সর্ব্বেশ্বর, আমার পূজা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?”—এই-না দুর্ব্বল-বিশ্বাসীর সংশয়? বিশ্বাসের কর্ণে ভগবানের আশ্বাস-বাণী শুনিলে সন্দেহ বা সংশয় কি আর থাকে? আরও কত আশ্বাস-বাণী আছে। ভক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে, তিনি সংসার-যাত্রাও নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া থাকেন, মোক্ষও দিয়া থাকেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভক্ত যে অন্য কর্ম্ম চেষ্টা করিবে, ইহা ত তিনি সহ্য করিতে পারেন না, তাই বলেন,—

“অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥”

ভক্তের জন্য তিনি আপনিই যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। যদি এখনও ভক্ত হইতে না পারিয়া থাক, যদি এখনও ‘আমার কর্ম্ম’ ‘আমার কর্ম্ম’ বলিয়া অভিমান আছে বুঝিতে পার, এ অবস্থায় তিনি তোমার যোগক্ষেম বহন করেন না সত্য; এই কর্ত্তৃত্বাভিমানীদিগকে তিনি বলিতেছেন,—‘তোমার যতদিন ‘অহং কর্ত্তা’ বোধ আছে, তোমার যতদিন ‘আমার কর্ম্ম’ বোধ আছে, ততদিন তুমি তোমার সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর, আমার প্রীতি জন্য কর্ম্ম করিতেছ স্মরণ করিয়া,সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে থাক,‘যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।’ আহার ভ্রমণাদি লৌকিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, দান তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্ম,—যাহা যাহা ‘তোমার কর্ম্ম’ বলিয়া অভিমান

করিতেছ, তাহাই আমাতে অর্পণ কর। কর্ম্ম করিবার আদিতেই মনে মনে জিজ্ঞাসা কর—'আমার এই কর্ম্মে তুমি কি প্রসন্ন হইবে?' ইহা বলিলে বিহিত-কর্ম্ম ভিন্ন নিষিদ্ধ-কর্ম্ম তুমি আর করিতেই পারিবে না। তখন আমি তোমায় একান্তে মৎকর্ম্মের ভার প্রদান করিব, আমার সেবায় অধিকার দিব। সে অবস্থায় তোমার আহারের চেষ্টাও করিতে হইবে না, যোগক্ষেম আমিই বহন করিয়া আনিয়া দিব।"—এমন আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায়?

আশ্বাস-বাণী সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে? জীবের তপ্ত-হৃদয়ে ইহার কতই প্রয়োজন! এ জগতে তাপী কে নয়? কাহার না আশ্বাস বাক্য আবশ্যক? যাহাতে প্রাণ জাগিয়া উঠে, হৃদয় সবল হয়, বুদ্ধি সংশয়-শূন্য হয়, মন বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করে, তাহাতে কাহার প্রয়োজন নাই? যাহা সুপ্ত প্রাণকে জাগরিত করে, হতাশকে আশা দেয়, অলসকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, পাপী তাপীকে কুকর্ম্ম কুচিন্তা ত্যাগ করায়,—জগতে এমন সাধু হইয়া কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি "অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ" এই আশ্বাস-বাণীর প্রয়োজন বোধ না করেন? এই 'অনাদি মোহ-নিশা-সুপ্ত' জীবজগতে অনবরত কত দুঃস্বপ্ন উঠিতেছে, 'জরামরণ-হর্ষামর্ষাদি-অনর্থসঙ্কুল কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে, এই 'তাপত্রিতয়-দাবানল-জ্বালা-মালাকুল সংসারারণ্যে' কত বিবেকান্ধ জীব নিরন্তর মোমুহ্যমান হইতেছে, 'অরিষড়্বর্গ-ব্যাধ-বধ্যমান প্রাণি-নিকর-কণ্ঠ হইতে' কতই কাতরোক্তি নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিতান্ত দুঃখী জীবকে আনন্দ-নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর কে সমর্থ? ভগবদ্বাণী নির্জ্জীব হৃদয়ের সঞ্জীবনী মহৌষধি। গীতার মধুর-গীতি শ্রবণে প্রাণ আনন্দে নিদ্রিত হয়, গীতার মৃদুবেদান্তরসাস্বাদে চিত্ত-বালক হেলিয়া দুলিয়া সুন্দর খেলা করে। কোন ভক্ত আত্ম-রসাস্বাদী চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা গীতা-সুধা-পান-বিভোর সাধক-চকোরের গদ্‌গদ-মধুর ভাষা মাত্র, ভক্ত বলিতেছেন,—

যশোদা-গীতমধুরৈ র্মৃদুবেদান্তভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে?
নবনীতরসগ্রাসচমৎকারৈঃ স্বসম্বিদাম্।
অন্তরাপ্যায়িতো বালো মুকুন্দ ইব খেলসি?

সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি ?
দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।
মৃত্যুঞ্জয়-পদ-প্রাপ্তঃ কিং নৃত্যসি হরো যথা ?

যশোদার মধুর-গীতি শ্রবণে বাল-মুকুন্দের সুনিদ্রার ন্যায় গীতার ম আশ্বাসবাণী ব্যাকুল জীবকে নিদ্রায় নিদ্রিত করুক। গীতার নবনী রস-গ্রাস-সদৃশ আত্মাস্বাদনের চমৎকারিতা অশান্ত চিত্ত-বালককে আপ্যায়ি করিয়া বাল-মুকুন্দের ন্যায় লীলাপরায়ণ করুক। বাসনাব্যাকুল জীব, গীত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সমাধি সায়ংকালে স্নিগ্ধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শ উমার সন্দর্শন করিতে করিতে মহেশের মত আনন্দে নৃত্য করুক। আর দৃ প্রপঞ্চরূপ গরল পান করিয়া, আত্ম-বোধে দৃশ্যজ্ঞানমার্জ্জনপূর্ব্বক. দেবদে মত মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা

এস্থানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—জগতের অন্যস্থানে যে যে মহাপুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন কিন্তু গীতার সর্ব্ব স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে, পুরুষোত্তম 'পরমেশ্বর', 'অন্তর্যামী 'ভগবান্', 'আত্মা', 'ক্ষেত্রজ্ঞ' ইত্যাদি বলিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সাধুকে কৃ করেন. অসাধুকে শাস্তি প্রদান করেন, সংসারে যাহারা নরাধম, তাহাদিগকে অজস্র অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।"

নির্গুণ পরমাত্মা মায়া-আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে আত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ও গুণতত্ত্ব প্রকাশ করা দুঃসা কেন হইবে ? যিনি অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান তিনিই আত্মমায়ায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থা করিয়াও মূর্ত্তিগ্রহণপূর্ব্বক লীলা করেন, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। মানু আপনার গোপনীয় জঘন্য চরিত্র সর্ব্বদা অবগত থাকিলেও, এই চরিত্র গোপ করিয়া লোকসম্মুখে ভদ্রোচিত আচরণ করে, বৃদ্ধ আপন স্বরূপ সর্ব্বদা স্মর রাখিয়াও বালক সাজিয়া বালকের সহিত খেলা করিতে পারে, নট নটী আপন আপন অবস্থা বিস্মৃত না হইয়াও রঙ্গমঞ্চে রাজা-রাণীর অভিনয়ে লোক-সমাজ

মুগ্ধ করিতে পারে, এ সকল যদি অসম্ভব না হয়, তবে ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়াও পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে লীলা করা অসম্ভব হইবে কি রূপে? বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন,—

চিৎ প্রকাশাত্মিকা নিত্যা স্বাত্মন্যেবাবসংস্থিতা।
ইদমন্তর্জগদ্ধত্তে সন্নিবেশং যথা শিলা॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৩১।৩৬

প্রকাশাত্মিকা নিত্যা চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও স্ফটিকশিলা যেমন আপনাতে বন-নদ্যাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ আপনার অন্তরে এই জগদ্‌ভাব ধারণ করিতেছেন।

অদ্বিতীয়া দধানেদং বিকারাদি-বিবর্জ্জিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি স্পন্দতে নো ন বর্দ্ধতে॥

ঐ ঐ ৩৭।

অদ্বিতীয়া চিতি, নির্ব্বিকারভাবে এই জগদ্‌ভাব ধারণ করিলেও, কদাচ অস্তমিত, উদিত, স্পন্দিত বা বর্দ্ধিত হইতেছেন না।

সঙ্কল্পাৎ জীবতামেত্য নিঃসঙ্কল্পাত্মনাত্মনা।
চিজ্জড়ং নো জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তী স্বসংস্থিতা॥

ঐ ঐ ৩৮।

সঙ্কল্প-বলে ঐ চিতি, জীব-ভাবধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্প ভাবে আপনাতে অবস্থানপূর্ব্বক, ঐ জড়-জগৎ, অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা-করতঃ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বেও কিছু বিশেষত্ব আছে। যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত, আর যাহারা তাহা পারে না, তাহারা মূঢ়, তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন :—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

হে পার্থ! দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্য-চিত্ত হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। আর :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘ-জ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

আমি ভূত-সমূহের পরমেশ্বর, আমার পরমভাব না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। ইহাদিগের বিবেক থাকে না বলিয়া সমস্ত ফলপ্রার্থনা মিথ্যা হয়। ইহারা ঈশ্বর-বিমুখ বলিয়া ইহাদের কর্ম্মও নিষ্ফল, ইহাদের জ্ঞানও কুতর্কাশ্রয়ে নিষ্ফল হয়। ইহারা হিংসাদি-বহুল তামসী-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কাম-দর্পাদি-প্রচুর রাজসী-প্রকৃতি ইহাদের বুদ্ধি-ভ্রংশ করে। ইহাদের হৃদয়ে রাক্ষসের মত অন্য জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আচারাদির উপর একটা বিদ্বেষ থাকে। ইহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-বিষয়-ভোগ-জনিত আসুর-ভাবও প্রাপ্ত হয়, এবং ভ্রষ্ট-মার্গ আশ্রয় করে। সমস্ত ষোড়শ অধ্যায় ধরিয়া এই আসুর ও রাক্ষস-ভাব-বিশিষ্ট মানবের ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানেই বলা হইয়াছে, রাক্ষসী আসুরী যোনি-জাত মনুষ্য অল্পবুদ্ধি, মলিন-চিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়। বলা হইয়াছে—"প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।" ভগবান্ স্বহস্তে ইহাদিগের দণ্ড বিধান করেন। গীতার অবতার-বাদের এই সমস্ত বিশেষত্ব।

সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সাধনার বিশেষত্ব উল্লেখ করা যাইতেছে। গীতোক্ত সাধন-মার্গসমূহের বিশেষত্ব নিষ্কাম-কর্ম্ম। লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম, আত্ম-সংস্থযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ; সাধক ইহার যে কোনটি অবলম্বন করুন না কেন, সর্ব্ব প্রকার সাধনাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যব-হার রহিয়াছে। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম হইতে ফলকামনা বিগলিত করা নিষ্কাম কর্ম্ম; উপাসনায় ও ভক্তিযোগে কেবল ঈশ্বর-প্রসন্নতা কামনাও নিষ্কাম কর্ম্ম; জ্ঞানযোগে অহং অভিমান দূর করাও নিষ্কাম কর্ম্ম। কামনার স্থূল অবস্থাই কর্ম্ম। কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া গেলে, স্বভাবে পরিণত হয়; এই স্বভাব অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই স্বভাব মনুষ্যের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম্ম-প্রবণ হয় না; কোন-কিছু নিমিত্ত পাইলেই কর্ম্ম হইয়া যায়। যাঁহারা ভগবানের প্রীতির জন্য পুরুষকার অবলম্বন করেন, তাঁহারাই আপন পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বতোভাবে ভগবদাশ্রয়ে স্থিতিলাভ করাই

প্রারব্ধক্ষয়। এই অবস্থায় পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম হইলেও, সে কর্ম্মের লাভালাভ, জয়পরাজয় ইত্যাদি কোন ফল-কামনাতেই লক্ষ্য থাকে না; লক্ষ্য থাকে একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতিতে। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কামভাবে সাধিত হয়। পুস্তকমধ্যে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে ইহার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। গীতায় যতগুলি সাধন-ক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থানে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাধন-ক্রমগুলি স্বাভাবিক না কাল্পনিক? আমরা কর্ম্ম-সঙ্কেতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। এখানে এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন—প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। ক্রম অনুসারে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি পরিচালিত করিলেই আমরা যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—সাধনার এই ত্রিবিধ ক্রম প্রাপ্ত হই। যোগ-সাধনার অত্যাবশ্যক কর্ম্ম প্রাণায়াম, ভক্তি-সাধনার প্রধান কার্য্য মানস-পূজা ও জ্ঞান—সাধনার ভিত্তি—আত্ম-বিচার। প্রাণায়ামে শরীরের ও মনের বলাধান হয়, মানস-পূজায় মন ভগবদ্রস আস্বাদনে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে, বিচারে আত্মা পরমাত্মার একত্ব স্থাপনে সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন। গীতা যে স্থানে এই ক্রম দেখাইতেছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্ম-যোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ১৩।২৫-২৫

উত্তম অধিকারী সমাধি-সহকৃত ধ্যান-যোগে শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা বুদ্ধিতে আত্ম-দর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী সাঙ্খ্য-যোগে এবং মন্দ অধিকারী কর্ম্ম-যোগে দর্শন করিয়া থাকেন। অতি নিকৃষ্ট অধিকারী পূর্ব্বোক্ত সাধনা না জানিয়া আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরূপদেশ-পরায়ণ হয়েন বলিয়া, মৃত্যুময় সংসার-সাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন। এখানে আমরা দেখিতেছি, আত্ম-দর্শনমাত্রই লক্ষ্য; তজ্জন্য ধ্যান-যোগ, সাঙ্খ্য-যোগ, কর্ম্ম-যোগ এবং উপাসনা, ইহাই ক্রম।

প্রথমে উপাসনা—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও, দূর হইতে উহাদের কর্ম্ম একরূপ বোধ হইতে পারে। স্থূল দৃষ্টিতে তমঃ ও সত্ত্ব-গুণের সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পার্থক্য আছে। বিশ্বাসীর ভক্তি ও ভক্তের ভক্তি, বিশ্বাসীর উপাসনা ও ভক্তের

উপাসনা একরূপ হইতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তি উহাদিগকে একরূপ মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। উপাসনা, কর্ম্ম-যোগ, সাঙ্খ্য-যোগ এবং ধ্যান-যোগ সম্বন্ধে আমরা এস্থানে সঙ্ক্ষেপে দুই একটি কথামাত্র বলিয়া রাখিব। গীতার লক্ষ্য সঙ্কেতে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এককালে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার হয় না সত্য, কিন্তু প্রতিদিনের সাধনায় ইহাদের কার্য্য চলিবে, শাস্ত্র ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

"জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।
জপধ্যানপরিশ্রান্ত আত্মানং চ বিচারয়েৎ॥"

এক্ষণে সাধনার কথা বলা যাইতেছে।

১। উপাসনা।

ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" আমার শরণাপন্ন হও ; "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—"মনের নিবৃত্তি করিতে পারিতেছ না, লয় বিক্ষেপ দূর করিতে পারিতেছ না, ইহাতেই বা তোমার ভয় কি ? তুমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, চিন্তা কর ; আমি তোমার সমস্ত পাপ-রাশি দূর করিয়া দিব, তুমি শোক করিও না। সর্ব্বদা আমাকেই লক্ষ্য কর, সর্ব্বকালে মনকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। মন যখন অসুস্থ হইবে, তখনই ইহাকে আশ্রয়দাতার কথা স্মরণ করাইও, নির্ভয় হইয়া যাইবে। চিত্ত অপ্রসন্ন হইলেই ভগবান্ আত্মাকে স্মরণ করিয়া সুস্থ হইতে অভ্যাস কর। স্বামীর বিরহে কাতর হইয়া স্ত্রী যদি বাহিরে ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার ব্যভিচার হয় মাত্র। এইরূপ ব্যভিচার তুমি করিও না।"

গীতার সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সকাম কর্ম্ম হইতে গীতা আরম্ভ হয় নাই। যদিও সকাম কর্ম্মের কথাও গীতাতে আছে।

২। কর্ম্মযোগ।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, সেই উপাসক হইতে পারে। সাধনার প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, কিছুই বিচারের আবশ্যকতা থাকে না ; কেবল বিশ্বাস রাখিলেই হয় যে "তিনি মঙ্গলময়, তিনি আমার মঙ্গল করিবেন।" উপাসনা দ্বারা মনকে বাহিরে সুস্থ করিয়া কর্ম্মযোগে ইহাকে ভিতরে স্থির রাখিতে হইবে। ষট্‌চক্রমধ্যে মনকে প্রথম রাখিতে হইবে,

ক্রমে মন কূটস্থমধ্যে নিরন্তর থাকিতে অভ্যস্ত হইবে। ইহাই আত্ম-সংস্থ যোগ। কি লৌকিক, কি বৈদিক, সকল কর্ম্মই যখন সাধক নিষ্কাম-ভাবে করিতে অভ্যস্ত হয়, তখনই আত্ম-সংস্থযোগে আত্ম-রসাস্বাদনে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়। কিন্তু আত্ম-সংস্থযোগ পরিপক্ক করিবার জন্য ভক্তিযোগের আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্রসাস্বাদন করিয়া শম, দম ইত্যাদি সাধনে সবল হইতে থাকে। এখানে কর্ম্মযোগের দুইটি বিভাগ করা হইল। একটি অষ্টাঙ্গ যোগ এবং দ্বিতীয়টি ভক্তিযোগ।

৩। সাঙ্খ্য-যোগ।

মন, কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা যখন সুস্থ হইবে, যখন ঈশ্বর-রসাস্বাদনে আনন্দ পাইবে, শরীর রোগদ্বারা পীড়িত হইবে না, প্রাণ রিপুকর্ত্তৃক চঞ্চল হইবে না, চিত্ত তখন আপনিই বিচার করিতে সমর্থ হইবে। যাহার জন্য কর্ম্ম করি, যাহাকে উপাসনা করি, যাহার ভজনা করি, তাহাকে দেখিতে, তাহাকে বুঝিতে, কাহার না ইচ্ছা হয়? সাঙ্খ্যযোগে বিচার মাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর কে, কাহার শরণাপন্ন হইয়াছি, কোথায় তিনি আছেন, কেমন করিয়া তিনি আমায় রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ভগবান্ আত্মা, তিনি আমার অতি সমীপে, চিত্ত এই সমস্ত তত্ত্ব বিচার করিবে। বিচার করিতে করিতে বুঝিবে, তিনি এই দেহ নহেন, তিনি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নহেন—তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় নহেন—জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায় তিনি তাহার কিছুই নহেন, অথচ তিনি আছেন। তিনি না থাকিলে দেহ জড়, জগৎ জড়, কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপে "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাঽনঘ।" ভগবান্ আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিয়া গুরুমুখে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহা আরম্ভ করিতে হইবে।

৪। ধ্যান-যোগ।

ভগবান্ আত্মার কথা সৃষ্টি ও সংহার-ক্রমে শুনিতে শুনিতে—গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে যাহা শ্রবণ করা হইল—একান্তে তাহারই মনন হইতে থাকিবে। দৃঢ়রূপে মনন আসিলেই ধ্যানযোগ আরম্ভ হইল, তখনই "তত্ত্বমসি" সাধনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাই আত্ম-দর্শন, ইহাই জীবন্মুক্তি।

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" জীব

আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করে, ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

সংসারোত্তরণে জন্তোরুপায়ো জ্ঞানমেব হি।
তপো দানং তথা তীর্থমনুপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যাদ্দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোঽভিবাঞ্ছ্যতে॥

যোঃ উপ ৭৩।৩৭

একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায়; তপস্যা, দান বা তীর্থ, ইহারা উপায় নহে।

যে পর্য্যন্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই সেই জীব মূর্খতা বশতঃ দীনভাবে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি আত্ম-জ্ঞানের উপায় বটে, কিন্তু ভক্তি আনন্দ-স্বরূপে স্থিতি প্রদানে অসমর্থ।

ভক্তি সম্বন্ধে বশিষ্ঠ দেবের উক্ত মত শ্রবণে, অনেকে যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উপরে অভক্তি প্রকাশ করেন, এবং শঙ্করাচার্য্যও ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ইঁহাদের বিচারে—ভগবান্ ব্যাসদেব কোথাও ইহা প্রকাশ করেন নাই যে, ভক্তিতে মুক্তি হয় না। বাস্তবিক আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন "ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য, ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী" ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তিই মোক্ষ প্রদান করেন। অঃ রাঃ যুদ্ধকাণ্ড ৭। ৬৭। ভগবান্ ব্যাসের এই সমস্ত উক্তি সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী ইত্যাদির উপর একটা ঘৃণা প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসদেব সর্ব্বত্র ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যোগ, জ্ঞান বা ধ্যানের উপর কোথাও বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই, এবং ভক্তিমার্গের লোকে যোগ জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা করিবেন না, এ কথা কোথাও বলেন নাই। "ভক্তিই মুক্তি" তিনি যে স্থানে বলিতেছেন, তাহা কোন্ অর্থে বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার কথা দিয়া উহা প্রদর্শন করিব, এবং আশাকরি, ব্যাসদেবের মতটি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলে ভক্তি জ্ঞান ও মুক্তি এই ক্রম সম্বন্ধে বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়-
স্ততো ভবেদ্ জ্ঞানমতীবনির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ,
সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥ অঃ রাঃ সুন্দর ৪।২২

ভক্তিতে সাধক কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়েন, ব্যাসদেব উপরের শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে তত্ত্বানুভব হইলে পরমপদপ্রাপ্তি হয়। তথাপি তিনি যে বলিতেছেন "ভক্তিই মুক্তি" তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিতেছেন—

"প্রথমং সাধনং যস্য, ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু।
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তিঃ, মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্॥"

অরণ্য ১০।৩০।

ভক্তির যে সমস্ত সাধনা আছে, ক্রম অনুসারে প্রথমটী হইতে আরম্ভ করিলে মুক্তি আসিবেই, এই জন্য ব্যাসদেব ভক্তিকেই মুক্তি বলিতেছেন। ব্যাসদেবের মতে অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং তত্ত্ববিচারও ভক্তি-সাধনার অঙ্গ।

সাধনমার্গে ভক্তির স্থান কোথায়, ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক; এজন্য আমরা ব্যাসদেব-প্রদর্শিত ভক্তি-সাধনার ক্রম এখানে উল্লেখ করিব।

তস্মাদ্ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্॥ ২২
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপ স্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ॥ ২৩
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ॥ ২৪
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে॥ ২৫
মদ্ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা॥২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি-সাধনং যস্য কস্য বা॥ ২৭

স্ত্রিয়া বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ॥ ২৮
ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভব-সিদ্ধস্তু মুক্তি স্তত্রৈব জন্মনি ॥ ২৯
স্যাৎ তস্মাৎ কারণং ভক্তি র্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তির্মুক্তিরেব সুনিশ্চতম্ ॥ অঃ, রাঃ,
অরণ্য ১০ অধ্যায়।

প্রেমলক্ষণা ভক্তির সাধনক্রম নববিধ—(১) সৎসঙ্গ, (২) মৎকথালাপ, (৩) মদ্‌গুণ স্মরণ, (৪) আমার বাক্য ব্যাখ্যা, (৫) আচার্য্য ও আমি এক বুদ্ধিতে আচার্য্যোপাসনা ও যমনিয়মাদি যোগের বহিরঙ্গ সাধনা, (৬) নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা, (৭) মন্ত্রজপ, (৮) ভক্তপূজা "সর্ব্বভূতে নারায়ণ-বোধ," বিষয়-বৈরাগ্য ও শম-সাধনা (৯) তত্ত্ব-বিচার। এই সমস্ত ভক্তিসাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তি জন্মে। ভক্তি জন্মিলে আমার তত্ত্বের অনুভব হয়। আমার অনুভবই মুক্তি। এই কারণে ভক্তিকে মুক্তি বলা হইল; কারণ সাধনাক্রমের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে, অন্ত অন্যগুলি ক্রমানুসারে আসিবেই। ভগবান্ ব্যাসদেবের এই মতের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ও শঙ্করের মত একই। মূঢ় বুদ্ধিতেই গোঁড়ামি। আমরা ভাগবত হইতে ইহাই দেখাইতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলিতেছেন,—

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্‌ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

১ম স্কন্ধ ২।২০-২১

পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন "এবকারেণ জ্ঞানানন্তরমেবেতি সূচয়তি।"

নিষ্কাম কর্ম্মে ভগবৎসেবা দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমো-ভাব এবং কাম-লোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয়। চিত্ত, তখন সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ

হয়, ইহাই মুক্তি। এইরূপে আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মক্ষয় হয়। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কথাটি আরও বিশদ করিয়াছেন। শ্রীধর বলেন—"দৃষ্ট এব" শব্দে আত্মদর্শন হইলেই হৃদয়-গ্রন্থি প্রভৃতি দূরীভূত হয়, নৈষ্ঠিক ভক্তি দ্বারা নহে। এখানে ভক্তিযোগের নিন্দা করা হইতেছে না, যাঁহারা মোক্ষলাভের ক্রম-বিপর্য্যয় করিয়া, উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে পরিণত করিয়া, সাধনকে বাঁধন করিয়া আবদ্ধ রহিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সাবধান করা হইতেছে মাত্র।

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন,—

"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ॥
তদাঽবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
এবং বিজ্ঞায় মদ্‌ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি॥"

ভক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি ইহাই ক্রম। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, বিনা জ্ঞানে মুক্তি বা আনন্দস্বরূপে স্থিতি নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ-প্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥"

বোধসারে দেখা যায় বহু পূর্ব্বেও এদেশে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, মুক্তির এই ক্রম সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত ছিল। এই জন্য বোধসার-প্রণেতা মুক্তির ক্রম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ-ব্যাসাদি ঋষির মতই সমর্থন করিতেছেন; বলিতেছেন,—

"ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি॥"

জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। আবার ভক্তি ভিন্ন শত উপায় অবলম্বন করিলেও জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই।

"ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥"

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই সাধারণ ক্রম। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত।

যাঁহারা বলেন যে ভক্তি ও জ্ঞানে কোনও পার্থক্য নাই, তাঁহাদের বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা এখনও হয় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, পরমজ্ঞান ও পরা ভক্তির কোন পার্থক্য নাই। পরম জ্ঞান ও পরাভক্তির কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থানে মুক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিপ্রায়েরও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

"কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং ন জায়তে ॥
সাক্ষাৎ মোক্ষং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানং পরতরং মতম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সর্ব্বমুপাসিতম্ ॥
জ্ঞাতং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥
পাপ্মানং তরতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎ সত্যং হি লভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানমেব সমাচরেৎ ॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥"

এই পীঠমালাতন্ত্রে মহাদেব আবার বলিতেছেন :—

"আত্ম-ভিন্নং পশ্যতশ্চ কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তি র্জায়তে দেবি তপোদানব্রতাদিভিঃ ॥"

সর্ব্বশাস্ত্রের যাহা মত, গীতার মতও তাহাই। তবে যে বলা হইয়াছে, ধ্যান-যোগ, কর্ম্মযোগ বা উপাসনা ইহার কোন একটি অবলম্বন করিলেই মুক্তি, সে কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভের ক্রম মাত্র। সাধনার ক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা

করা হইল। আমরা উপসংহারে মুক্তিকোপনিষদ্ হইতে আরও কতকগুলি উপায় দেখাইয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম।

"রাম কেচিন্মুনিশ্রেষ্ঠা মুক্তিরেকেতি চক্ষিরে।
কেচিৎ ত্বন্নামভজনাৎ কাশ্যাং তারোপদেশতঃ॥
কেচিত্তু সাংখ্যযোগেন ভক্তিযোগেন চাপরে।
অন্যে বেদান্তবাক্যার্থবিচারাৎ পরমর্ষয়ঃ।
সালোক্যাদিবিভাগেন চতুর্দ্ধা মুক্তিরীরিতা॥ ১৩॥"

এই সমস্ত উপায়ে সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু কৈবল্যমুক্তি বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না।

"অতএব ব্রহ্মলোকস্থা অপি ব্রহ্মমুখাৎ বেদান্তশ্রবণাদি কৃত্বা :তন সহ কৈবল্যং লভন্তে, অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞান-াাত্রেণোক্তা, ন কর্ম্মসাংখ্যযোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষৎ।"

পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি হইবে না। এই ার্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি বা পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নামই জীবন্মুক্তি বা বিদেহ-মুক্তি। যাগ, ভক্তি ও জ্ঞান-রূপ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীব এই কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিতে পারে, এইজন্য এই সমস্ত সাধনা ক্রম-অনুসারে আবশ্যক। শ্রুতি :কবল্য মুক্তির জন্য উপদেশ করিতেছেন।

"মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তং
সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং গুণবন্তমকুটিলং
সর্ব্বভূতহিতে রতং দয়াসমুদ্রং সদ্গুরুং বিধিবদুপ-
সঙ্গম্যোপহার-পাণয়োঽষ্টোত্তরশতোপনিষদং বিধিব-
দধীত্য শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিনৈরন্তর্য্যেণ কৃত্বা প্রারব্ধ-
ক্ষয়াদ্দেহত্রয়-ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধি-বিনির্ম্মুক্তঘটাকাশবৎ
পরিপূর্ণতা বিদেহমুক্তিঃ সৈব কৈবল্যমুক্তিরিতি।"

সাধ্যবিষয়ের কথাও বলা হইল, সাধনার বিষয়ও বলা হইল। জীব যে মুক্ত হইতে চায় না, ইহাও নহে। কিছুই যে চেষ্টা করে না, তাহাও ত বলা যায় না। তবে জীবের যাহা লক্ষ্য, তথায় যাইতে পারে না কেন?

জীবের লক্ষ্য আর একবার চিন্তা কর। যিনি আত্মানুভব-সন্তুষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্ত। লোক এই "আত্মানুভব-সন্তুষ্ট" হয় না কেন? এক সঙ্গে দুই রস ভোগ হইতে পারে না। যিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন, তিনি আত্মাস্বাদ পাইবেন কিরূপে? যিনি দেহাস্বাদ করেন, তাঁহার কি আত্মাস্বাদ হয়? আর এক সঙ্গে দুইয়ের জ্ঞানও তিষ্ঠিতে পারে না। দেহজ্ঞান যাঁহার প্রবল, তাঁহার আত্মজ্ঞান হইবে কিরূপে? দেহদর্শন বা বিষয়দর্শন যাঁহার হয়, তাঁহার আত্মদর্শন হইবে না। দেহ দর্শন করিতে করিতে, "আমার দেহ", "আমার দেহ" বোধ হয়, তখন দেহে আত্মাভিমান জন্মে। "দেহ আমি" "দেহ আমি" এই বোধ প্রবল হইলেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। দেহাভিমানজ শোক ত্যাগ কর এবং আত্মানুভব-সন্তুষ্ট হও। "আমি দেহ নহি", "আমি আনন্দস্বরূপ" এই দুইয়ের অনুভবেই জীবন্মুক্তি।

"ধ্যানেনাত্মনি" ইত্যাদি শ্লোকে জীবন্মুক্তির সাধনার যে ক্রম গীতা দেখাইতেছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। সাধনার ক্রম দুইটি।—(১) সৃষ্টিক্রম, (২) সংহারক্রম। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দুঃখী জীব কিরূপে আসিল, ইহা বুঝিতে পারিলেই দুঃখী জীবের নিত্যানন্দপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইল। ইহা সৃষ্টিক্রম। আবার জীবের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান আছে, তাহার বিচার দ্বারা যখন আনন্দ-স্বরূপ আত্মা পাওয়া যায় না, যখন প্রকৃতির কোন কিছুকেই আত্মা বলা যায় না; অথচ আত্মা আছেন এই বোধ থাকে; আত্মার আভাস পাওয়া যায়, অথচ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না; এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা হয়, তখনই আত্মস্বরূপ দর্শন হয়। ইহা সংহার ক্রম। সৃষ্টিক্রম ধরিয়া জীবন্মুক্তির পথগুলি আর একবার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) জীবন্মুক্ত জানেন যে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

জীবন্মুক্তের স্থিতি এই আনন্দের ধ্যানযোগে। (২) যিনি "অহং ব্রহ্মাস্মি" ধারণা করিতে পারেন নাই, তিনি "প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" ইহাই অনুশীলন করিবেন। ইহাই সাংখ্যযোগ।

(৩) সাংখ্যযোগে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি উপাস্য

বস্তুতে চিত্ত একাগ্র করিবেন; ইহাতেও অসমর্থ হইলে আত্মসংস্থ হইবার জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন। প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি লাভ করিয়া আত্মসংস্থ হওয়াই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

(৪) যাহারা বৈদিক কর্ম্মযোগেও অসমর্থ, তাহারা লৌকিক কর্ম্মাদি করিবে, কিন্তু কর্ম্মের আদিতে ও কর্ম্মশেষে "তুমি প্রসন্ন হও" এই ভাব বিস্মৃত হইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা। সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরের কৃপা-ভিক্ষাই উপাসনার উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত সাধনক্রমগুলি কখন কখন প্রত্যহ আলোচিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন সাধনক্রম-মত কার্য্য অভ্যাসকালে সর্ব্বদা শেষ লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা উপায়ই উদ্দেশ্য হইয়া যাইতে পারে। এজন্য আমরা শেষ উদ্দেশ্যটি পুনরায় আলোচনা করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

"অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরা সিদ্ধি র্নত্বনুষ্ঠান-দুঃখতঃ॥ উৎ। ৬। ১॥
ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাসে নালভ্যো বিষমেণ চ।
স্বানন্দাভাসরূপোঽসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে॥ ৩॥
কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপোদানব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্॥ ৪॥
সাধুসঙ্গম-সচ্ছাস্ত্রপরতৈবাত্র কারণম্।
সাধনং বাধনং মোহজালস্য যদকৃত্রিমম্॥ ৫॥
অয়ং সদেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞানমাত্রতঃ।
জন্তো র্ন জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্বমেতি চ॥ ৬॥"

এই দেবদেব পরমাত্মার সহিত একত্বসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ হয়। অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে হয় না। তিনি দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্ল্লভও নহেন। তিনি আপন আনন্দাভাসরূপ। নিজ শরীরেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

তপস্যা-দান-ব্রতাদি, তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী নহে। স্বরূপে অবস্থান ভিন্ন ইহার অন্য সাধনা নাই।

সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র এই দুইটি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। ইহারাই মোহজালের

অকৃত্রিম বিনাশ-সাধনের উপায়। 'ইনিই সেই দেব' এই জ্ঞান জন্মিবামাত্র জীবের আর কোন দুঃখ থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তি। "তস্মাদ্‌বিচারেণাশ্বে-বান্বেষ্টব্য উপাসনীয়ো জ্ঞাতব্যো যাবজ্জীবং পুরুষেণ নেতরদিতি।"

"যথাসম্ভবয়া বৃত্ত্যা লোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া।
সন্তোষসন্তুষ্টমনা ভোগগন্ধং পরিত্যজেৎ॥" যোঃ উঃ ৬।১৬

যথাসম্ভব শাস্ত্রাবিরোধী জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগগন্ধ ত্যাগ করিবে।

"সচ্ছাস্ত্রসৎসঙ্গমজৈর্বিবেকৈ স্তথা বিনশ্যন্তি বলাদবিদ্যাঃ।
যথা জলানাং কতকানুষঙ্গাৎ তথা জনানাং যতয়োঽপি যোগাৎ॥"
যোঃ উঃ ৬।২২

যেমন কতক ফল (নির্ম্মলী) দ্বারা জলের মালিন্য নষ্ট হয়, সেইরূপ যোগা-ভ্যাসে বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হয় এবং সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রে যে বিবেক জন্মে, তদ্দ্বারা অবিদ্যা বা সংসারমায়া দূর হয়।

"নশ্যতি সংসৃতি-দুঃখমিদং তে স্বাত্মবিচারণয়া কথয়ৈব।
নো ধনদানতপঃশ্রুতবেদৈ স্তৎকথনোদিত-যত্ন-শতেন॥"
যোঃ বাঃ, উঃ ৮।২২

আত্মজ্ঞান ও আত্মকথা ভিন্ন দান, তপঃ, বেদপাঠ বা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান—কিছুতেই সংসার-ক্লেশ দূর হইবে না।

চতুর্থ কথা।

গীতায় শক্তিসঞ্চার।

শক্তিসঞ্চার কার্য্য দ্বারাও সম্পাদিত হয় এবং জীবন্ত-বাক্য দ্বারাও হইয়া থাকে। এখানে শেষোক্ত শক্তিসঞ্চার আলোচিত হইবে।

আলস্য এবং অনিচ্ছা জগতের কতই না অনিষ্ট করিতেছে। শাস্ত্র যথার্থই বলিতেছেন—

"আলস্যং যদি ন ভবেজ্জগত্যনর্থং কো ন স্যাদ্‌বহুলধনো বহুশ্রুতো বা।
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা সম্পূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্ধনৈশ্চ॥"

মুমু ৫।৩০।

আলস্যই যদি জগতের অনর্থভূত না হইত, তবে জগতে বহুধন উপার্জ্জন না করিত কে? আর বহুজ্ঞান কে না লাভ করিত? এই সসাগরা ধরা যে মূর্খ নরপশু ও দরিদ্র মনুষ্যে পূর্ণ, আলস্যই তাহার কারণ। সকলেই কিন্তু আলস্য ত্যাগ করিতে পারে, সকলেই চেষ্টা করিলে আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে।

"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥" মুমু ৪।৮

এই সংসারে সম্যক্‌রূপে পৌরুষ প্রয়োগ করিলে সকলেই সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই উক্তি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের। সর্ব্বশাস্ত্রে পৌরুষের কথা আছে। গীতার উত্তেজনা বড়ই প্রাণস্পর্শী। "ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ" ইহাই কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে বিমনায়মান অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের প্রথম উপদেশ। উত্তেজনা জীবনে নিতান্ত আবশ্যক।

জীবন্ত-বাক্য নিমেষ মধ্যে সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে। "উত্তিষ্ঠ", "জাগ্রত" ইত্যাদি জীবন্ত-বাক্য আদিতে শক্তি সঞ্চার করে, আবার অন্তে "তত্ত্বমস্যাদি" জীবন্ত-মহাবাক্য পূর্ণশক্তি জাগ্রত করে, পূর্ণশক্তিকে শক্তিমানে মিশাইয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করে।

জীবন্ত-বাক্য সর্ব্বদা উপকারী। আবার যখন জীবন্ত-বাক্য উপদেষ্টার আশ্বাস-সঞ্চারী মধুর হাস্যের সহিত মিলিত হয়, যখন ইহা সর্ব্বসন্তাপনাশিনী শীতল-করুণ-দৃষ্টির সহিত জড়িত হয়, যখন গুরুর মৃদু অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দ্রুত-সঞ্চারী কথা-তড়িৎ হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়-গুহাশায়ী তমঃ-প্রকৃতিকে জ্বালাইয়া দেয়, যখন তমঃ-প্রকৃতি বিজলিমালা-বিজড়িত রক্তাম্বরে বিভূষিত হইয়া রজঃ-প্রকৃতিতে পরিণত হয়, তখন জীব মোহ অপসারিত করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য সগর্ব্বে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায় কার্য্যসিদ্ধির অধিক বিলম্ব হয় না। মন জাগিয়া উঠিলে সাত্ত্বিক উপদেশ রজঃ-প্রকৃতিকে শুভ্রবস্ত্র পরাইয়া দেয়, আর রজঃই তখন ধীরে ধীরে সত্ত্বরূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় জাগ্রত-কর্ম্মী শান্তভাবে আপন কর্ম্মটি বুঝিয়া লয় এবং সতর্ক হইয়া, ধীরে ধীরে প্রবল পুরুষকার-সহকারে কর্ত্তব্যের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে। শ্রীগুরুর স্নেহপূর্ণ বাক্য, তাঁহার সহাস্য উপদেশ, দুর্ব্বল চিত্তকে বল দিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে।

কিন্তু বিনা সাধনায় চিত্ত অধিকক্ষণ ঊর্দ্ধে থাকিতে পারে না। পক্ষিশাবক যখন প্রথম উড়িতে শিক্ষা করে, তখন তাহার বিপদ যেরূপ, এই চিত্তের অবস্থাও সেইরূপ। চিত্তকে সর্ব্বদা সবল রাখিবার জন্যই কর্ম্ম অভ্যাস আবশ্যক। বিনা অভ্যাসে গুরুদত্ত শক্তি জীবিত থাকে না। নিয়ম মত কর্ম্ম করিতে করিতে গুরু-সঞ্চারিত শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই অবস্থায় সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র শক্তির স্থায়িত্ব সাধনে বিশেষ উপকার করে।

যেমন সংসার-সমরে সাধারণ জীব অনেক সময়ে কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হয়, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরারম্ভে মোহগ্রস্ত হইয়াছেন, কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিয়াছেন, আর পরম কারুণিক ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, বলিতেছেন 'উত্তিষ্ঠ'। দেহরথে রথী অবসন্ন হইয়াছে, নিশ্চেষ্ট হইয়া সকল উদ্যম ত্যাগ করিয়াছে, আর ভগবান্ সারথিরূপে রথীকে উত্তেজিত করিতেছেন—

'রে জীব! তোমায় আপন আনন্দরাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে। অজ্ঞান-অসুর তোমার জ্ঞান-রত্ন চুরি করিয়াছে, তুমি আপন আনন্দরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছ, হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবার এইত সময়। জাগ্রত হও। কি জন্য মূঢ়ের মত অবস্থান করিতেছ? গুরু, কার্য্যকাল উপস্থিত। এখন

কি নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময়? উঠ, আপন পৌরুষ প্রদর্শন কর। আলস্য, অনিচ্ছা দূরে নিক্ষেপ কর। অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর, অন্য উন্মত্ত-চেষ্টা দূর কর। এই অনার্য্যসেবিত মোহ কি আর্য্যের উপযুক্ত? মোহগ্রস্তের ইহলোকে ও অযশ, পরলোকেও অধর্ম্ম। অর্জ্জুন! তুমি কাতরতা ত্যাগ কর। তুমি কি ইহার যোগ্য? "ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে". তুমি ক্লীবত্ব ত্যাগ কর'।

শ্রীভগবান্ জীবের মঙ্গল জন্য যাহা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার আশ্বাস-বাণী উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। জীবকেও শ্রীভগবানের জন্য কিছু করিতে হইবে। তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, জীবকে তাহা পালন করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট-জীবের প্রতি ভগবানের আশ্বাস-বাক্য কোন কার্য্য করিবে না।

শ্রীভগবান প্রথমেই অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিয়াছেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে হইবে---জীবকে ভগবানের কথামত কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে চলিবে না। জীব বৈদিক বা লৌকিক যে কর্ম্মই করুক না কেন, কর্ম্ম নিষ্কাম হওয়া চাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—তুমি ক্ষত্রিয় তোমার প্রধান কর্ত্তব্য ধর্ম্মযুদ্ধ। যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্-এই যুদ্ধ, বিনা প্রার্থনায় উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বার তুল্য—ইহাই তোমার স্বধর্ম্ম। যাহার করণীয় কর্ম্মটি ঠিক আছে, সেই সর্ব্বসিদ্ধ হইতে পারে; যে ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম ঠিক আছে তাহার মোক্ষ-সাম্রাজ্য অদূরে অবস্থিত। রজস্তমোভাব পরাভূত করিয়া নিত্য সত্ত্বস্থ হওয়া ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। যাহা করিতে হইবে তাহা যখন স্থির রহিল, তখন আর ভাবনা কি? কর্ম্ম ঠিক আছে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। মৃত্যু হয় হউক, কর্ম্ম কর; স্বর্গলাভ হয় হউক, কর্ম্ম কর; সুখ আসে আসুক, কর্ম্ম কর; দুঃখ আসে আসুক, কর্ম্ম কর। জয় হয় ক্ষতি নাই, লাভ হয় ক্ষতি নাই, কর্ম্ম কর। এই সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ ক্ষতি তিরস্কার পুরস্কার বিচার না করিয়া ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, ধর্ম্ম পালন কর—এই বোধে কর্ম্ম করাকে যোগ বলে। তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কোন প্রকার আলস্য করিতে পারিবে না। শীতকাল বা গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল বা অকাল কোন বিচার করিও না।

সুখ পাও বা দুঃখ পাও কিছুই বিচার করিও না। কোন বাধা বিঘ্ন মানিতে পাইবে না, স্বধর্ম্ম মত কর্ম্ম কর, কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া ভগবদাজ্ঞা বোধে স্বধর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে যখন শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে পারিবে, যখন তুমি রজস্তম ত্যাগ করিয়া নিত্য সত্ত্বস্থ হইতে পারিবে, যখন তুমি যাহা আছে তাহার রক্ষাতেও ব্যস্ত হইবে না, যাহা নাই তাহা পাইতেও ব্যাকুল হইবে না, যখন যে অবস্থায় যে দেশে থাক না কেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া আপন স্বধর্ম্ম করিবে, তখন তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগী হইয়াছ বুঝা যাইবে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, এই শিক্ষা মানুষে বিস্মৃত হয় বলিয়া মানুষ দুঃখ পায়, মানুষ ভগবানের নিকট অপরাধী হয়। নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার প্রথম শিক্ষা। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা এককালে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কর্ম্মদ্বারা জগতের অভ্যুদয় হইবে, জগচ্চক্র ঠিক পথে চলিবে, আবার কামনাত্যাগ জন্য জীবও জীবন্মুক্তি পথে চলিতে থাকিবে। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, জগতের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় এবং জীবের সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সোপান।

এ স্থানে আমরা জীবের প্রতি ভগবানের আজ্ঞা-বাক্যগুলি একত্র করিতেছি। যেরূপ বিপদের অবস্থাতেই জীব পতিত হউক না কেন, ভগবানের আজ্ঞা স্মৃতিপথে জাগ্রত করিলেই ভগবান্ চক্ষুর জল মুছাইবেন, জীবকে শান্ত করিবেন। তখন দুঃখ আর দুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না, বিপদ আর বিপদ থাকিবে না। ভগবান্ সহায়—ইহা অনুভূত হইলে আর কি কোন বিপদ থাকে ?

শ্রীভগবানের আজ্ঞা—

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২।১১
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২।১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২।১৫

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন মূর্খের মত শোক করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর। সুখে দুঃখে যদি ধৈর্য্য রাখিতে পার, অমর হইয়া যাইবে। ২।১৫

মানুষের যত প্রকার দুঃখ, তাহা দেহসম্পর্কেই জাত। আহার, নিদ্রা, মৃত্যুভয়—সমস্তই দেহজন্য। কিন্তু

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ২।১৮

আত্মার বিষয় জান, দেখিবে আত্মার বিনাশ হয় না, কিন্তু দেহ সর্ব্বকালেই বিনাশ-শীল। বল—শোক কাহার জন্য করিবে?

"নানুশোচিতুমর্হসি", ভগবানের এই আজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আহার না পাইলে, নিদ্রা না হইলে, আত্মার কোন ক্ষতি নাই। কোন হিংস্র জন্তু হইতে আত্মার ভয় নাই। ভয় কেবল, দেহকে আত্মা ভাবিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া,—যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই জীবন্মুক্ত, নির্ভয়। জ্ঞানী সকল অবস্থাতেই নির্ভয়, চিন্তাশূন্য, বিপদশূন্য। চিন্তা, বিপদ, ভয়—অজ্ঞানীর, সুখ দুঃখ সমস্তই অজ্ঞান-জনিত।

"তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি"॥ ২।২৫

ভগবান্ স্বধর্ম্ম পালন করিতে বলিতেছেন, ইহা শাস্ত্রলিখিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি॥ ২।৩১
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ২।৩৩

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না, কীর্ত্তি অগ্রাহ্য করিও না, ইহা পাপ জানিও।

আবার বলিতেছেন:—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ২।৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ২।৩৮

সুখ হউক বা দুঃখ হউক, লাভ হউক বা অলাভ হউক, জয় হউক বা পরাজয় হউক, তুমি আমার আজ্ঞামত চল। যদি এই কর্ম্মে মৃত্যু হয়, তবে

স্বর্গ লাভ হইবে, যদি জয়লাভ হয়, পৃথিবী ভোগ হইবে। মৃত্যু হয় হউক, কাজ করিয়া চল। মৃত্যু বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আত্মজ্ঞানহীনতাই মৃত্যু।

সমস্ত গীতা ধরিয়াই উপদেশ। আমরা কতকগুলি সংগ্রহ করিতেছি :—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ॥ ২।৪৮
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ২।৫৩
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ২।৬১
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ॥ ৩।৪
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৩।৮
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩।২৬
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩।৩৪
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৩।৪৩
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪।৪২
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫।২৯
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ॥ ৬।৪
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৬।৪৬
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬।৪৭
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৬।২২

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ॥ ৭।২৯

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। আমরা আর ২।১টি প্রধান উপদেশ তুলি :—

১। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭

২। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ॥ ৯।৩৪

৩। মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

৪। মামেকং শরণং ব্রজ ॥১৮।৬৬

৫। তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ১১।৩৩

জীবের হতাশ হইবার কোন কথাই নাই। শ্রীভগবান্ অনন্ত প্রকারে জীবকে উৎসাহ দিতেছেন, বড় আদর করিয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন, যাহা যাহা করিতে হইবে, সমস্তই বলিয়া দিতেছেন। 'যুদ্ধ কর'; কারণ এই কর্ম্মে জগতের অভ্যুদয় হইবে। নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধ কর—ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন বলিয়া যুদ্ধ কর—তুমি মুক্তিপথে চলিবে। যেমন বিনা কর্ম্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, সেইরূপ বিনা সঙ্কল্পক্ষয়ে, বিনা কামনাত্যাগে, কোটিকল্প বৎসর অতি উগ্র তপস্যা করিলেও মুক্তি হইবে না। মুক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে পরমানন্দে স্থিতি লাভ করা অসম্ভব। কুরুক্ষেত্র-সমরে শ্রীভগবান্ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় বিনাশ করিলেন, লোকে ভাবিতে পারে—আজ ভারতের দুর্গতি সেই জন্য। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যদি কুরুক্ষেত্র-সমরে দুষ্কৃতের বিনাশ না হইত, আর ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ গীতা প্রচারিত না হইত, তবে আমরা সত্যযুগের আশা কখনও করিতে পারিতাম না। আজ অতি দুর্দ্দিনেও গীতার প্রচার কি সূচনা করিতেছে—সর্ব্বজাতিমধ্যে গীতার ভাব প্রবেশ করিয়া কাহার আগমন-সংবাদ দিতেছে, সুধী ব্যক্তি তাহা বুঝিবেন।

জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য 'মাতেব হিতকারিণী' শ্রুতিও গীতার মত শক্তি-সঞ্চার করিতেছেন, বলিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

আত্মদর্শনে যত্নশীল মুমুক্ষু! উঠ, বিষয় ত্যাগ কর। তত্ত্বজ্ঞ গুরু লাভ করিয়া আত্মাকে জান। সেই জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হও। অজ্ঞান-নিদ্রা ত্যাগ কর। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারা যেমন দুরাক্রম্য, সেইরূপ উক্ত জ্ঞানের পথসমূহকে জ্ঞানিগণ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রুতি ত বলিতেছেন—বিষয় ত্যাগ করিতে, আর গীতা বলিতেছেন—যুদ্ধ করিতে, দুইই এক কথা কিরূপে? জীবের লক্ষ্য জগতের উন্নতি ও জীবন্মুক্তি। যে মনুষ্য নিতান্ত অজ্ঞান, তাহার গতি প্রবৃত্তি-মার্গে। প্রবৃত্তি পথে কখনও জগতের উন্নতিও হইবেনা, জীবন্মুক্তিও হইবেনা—হইবে আত্মহত্যা এবং জীব-হত্যা। আর যিনি জীবিতোদ্দেশ্য অবগত হইয়াও বিষয়কামনা ছাড়িতে পারিতেছেন না, অথবা বিষয়কামনা উৎপাটন না করিয়া একেবারে নিবৃত্তিমার্গে যাইতে চাহেন, শ্রীভগবান্ তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া গীতায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। আর যাঁহার আদৌ বিষয়বাসনা নাই, যাঁহার "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে" কেবল তাঁহারই জন্য নিবৃত্তি-মার্গের সাধনা। ইহা না হইলে জীবন্মুক্তি হইবে না। সত্য কথা, শ্রুতি বলিতেছেন—বিষয় ত্যাগ করিতে; কিন্তু বিষয় ত্যাগ, সকল মনুষ্যের একরূপে হইতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনায় কখন কখন বৈরাগ্যের উদয় হয় সত্য; সাধু সজ্জনের কথা শুনিয়া, তাহাই শাস্ত্রে সমর্থিত হইতে দেখিয়া, ক্ষণ-কালের জন্য বৈরাগ্য উদয় হইতে পারে সত্য, প্রকৃতির তীব্র কশাঘাতে, প্রিয় পুত্র-কন্যাদির মৃত্যু দর্শনে, ক্ষণকাল চিত্ত বিষয় ত্যাগ করে সত্য; কিন্তু ইহার নাম মর্কট-বৈরাগ্য। উত্তেজনা শিথিল হইলেই, ভোগবাসনা জাগিয়া উঠে। গীতা এই প্রবৃত্তির মনুষ্যকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতেছেন—বলিতেছেন—যত দিন দেখিবে ভোগবাসনা আছে, ততদিন কর্ম্ম কর। কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম

কর্ম্ম, কামনা-ত্যাগের কৌশল মাত্র। বিষয়-কামনা দূর না হইলে কখন আত্ম-জ্ঞান জন্মিবে না—বিষয় আস্বাদনের কামনা থাকিতে থাকিতে কখনই আত্মাস্বাদন-কামনা জাগিবে না। শ্রুতি বিষয়ত্যাগরূপ মূল কথা বলিয়াছেন, গীতা উহার উপায় পর্য্যন্ত বলিতেছেন; বলিতেছেন—ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। প্রবৃত্তিমার্গের জীবকে একবারে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ গীতা দিতেছেন না; বলিতেছেন, প্রবৃত্তির কর্ম্ম ছাড়িতে পার না; প্রথম প্রথম কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর, এই নিষ্কাম কর্ম্মে একেবারে দুই কর্ম্ম সাধিত হইবে। কর্ম্ম দ্বারা জগচ্চক্র সঞ্চালিত হইবে এবং কামনা ত্যাগ দ্বারা জীব মুক্তিপথে চলিতে পারিবে। অদ্ভুত শিক্ষা এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ! যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানভূমিকা কর্ম্মভূমিকার উপরে। জীব নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ক্রমে সাধনমার্গের উচ্চ উচ্চ স্তরে যত উঠিতে থাকিবে, ততই তাহার বিষয় ত্যাগ হইবে। সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় উঠিলেই সম্পূর্ণরূপে বিষয় ত্যাগ হইয়া যাইবে। ইহাই আত্মজ্ঞানের সময়, আত্মাস্বাদনের অবস্থা। গীতা ও শ্রুতি এক কথাই বলিতেছেন।

যদিও গীতা নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চ উচ্চ অবস্থা একটিও ত্যাগ করেন নাই। 'হট্' করিয়া কোন কিছুই উপদেশ দেন নাই।

পুনরুক্তি সকল স্থানে দোষের হয় না। জীবন্মুক্তির ক্রম-মতে প্রতিদিন সাধনা করিতে হইবে। যাহা প্রতিদিন অভ্যাস করিতে হয়, তাহার পুনরুক্তিই আবশ্যক। আমরা আর একবার ক্রমগুলি উল্লেখ করিব। যথায় যাইতে হইবে, যাহা করিতে হইবে, প্রতিদিন তাহার আলোচনা আবশ্যক।

জীব! তোমাকে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইবে। পথ বড় দুর্গম—কিন্তু পথ অনতিক্রমণীয় নহে। সংসার সাগর পার হওয়া যায়, মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া রহিত হয়, নিত্য আনন্দে, নিত্য জ্ঞানে, স্থিতি লাভ হয়।

তুমি অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর, পারিবেই। লৌকিক কর্ম্ম করিতে হয়, করিও, কিন্তু সচ্চিদানন্দ- তৃপ্তি জন্য করিও। উপাসনা, আত্মসংস্থযোগ, ভক্তি-যোগ, সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন কর। ধ্যানযোগ গীতার সাধনা। যেমন ভক্তিযোগ আত্মসংস্থ হইবার জন্য, সেইরূপ সাংখ্যযোগ ধ্যান জন্য। সমাধি-

ধ্যানযোগে নিরন্তর থাকিতে না পার, সাংখ্যযোগে নিম্নভূমিকায় আইস, সাংখ্য যোগে বিচার দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বোধ কর, আবার সমাধি-ধ্যানে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সাংখ্যযোগেও যখন "প্রকৃতেৰ্ভিন্ন-মাত্মানম্" বিচার না আসিবে, তখন ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। এই ভক্তিযোগ কেবল আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় করিবার জন্য। মানসপূজা ভক্তি যোগের শেষ কথা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তার বিশ্বরূপ চিন্তা কর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণীর মায়ামানুষ মূর্ত্তি ধ্যান কর, অর্দ্ধ-নারীশ্বরের কথা গান কর, গুণ স্মরণ কর, রূপ ধ্যান কর, ভগবান্ আত্মার যে রূপ তোমার প্রাণে লাগিয়াছে, তাহারই ধারণা ধ্যান করিতে থাক; যদি দেখিতে পাও, ভিন্ন ভিন্ন রূপেও তোমার প্রীতি, তুমি সেই ক্ষেত্রে পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কুলগুরুর আশ্রয় লইও। তাঁহার লীলা চিন্তা কর; জীবশক্তি, আপন সহচরী সঙ্গে ভগবান্ আত্মার অপেক্ষা করিতেছে, অনুভব করিতে থাক; প্রিয়-সম্ভাষণে যাহা যাহা আবশ্যক—সুন্দর পুষ্পশয্যা, সুন্দর রত্ন-খচিত আসন, স্নানার্থ জল, পরিধান জন্য দিব্যাম্বর, পূজার জন্য চন্দন, মৃগমদ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ভোজন, নৃত্য, গীত—এই সমস্ত মনে মনে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছ, আর অনুভব করিতেছ—তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না—এই ভাবনা করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়; কখন ভাবনা কর, যখন তুমি আসিবে, তখন আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, কেমন করিয়া তোমার সহিত কথা কহিব? কিরূপ ভাবে তোমার সেবা করিব? কখনও বা অভিমান করিব, এত দেরী করিয়া আসিলে কেন? তুমি ভিন্ন আমার আর যে কেহ নাই—এই সমস্ত অভ্যাস করিতে থাক। এতদ্দ্বারা আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় হইবে। এই ভক্তিযোগও যখন না পার, তখন আত্মসংস্থ হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা প্রাণকে ভগবান্ আত্মার গৃহে গৃহে উঠিতে নামিতে অভ্যাস করাও, চক্রে চক্রে মনোযোগের সহিত ভ্রমণ করিতে থাক, শেষে আর উঠিতে নামিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন মন আজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া জ্যোতিঃসমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবে, মন আর কিছুই চিন্তা করিতে পারিবে না। "মনোনিবৃত্তি" হইবে, "পরম শান্তি" তুমি প্রাপ্ত হইবে, আবার আত্ম-সংস্থ হইয়া যাইবে। গীতা বলিতেছেন—"শনৈঃশনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতি-

গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥” যোগের বহিরঙ্গ সাধন দ্বারাও মন যদি কখন কখন বিষয়ে ভ্রমণ করে “যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্” তখনই ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাকে আবার আত্মসংস্থ কর, তোমার সমাধি লাগিবে।

মন যখন প্রাণায়ামাদিতে অসমর্থ হয়, যখন লয়বিক্ষেপে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ক্লেশ পাইতে থাকে, তখন ইহাকে উপাসনা করিতে উপদেশ কর। বিশ্বাসে উপাসনা, ভক্তিতে মানসপূজায় প্রত্যক্ষ দর্শন। এ অবস্থায় সর্ব্বদা মনকে স্মরণ করাইতে হইবে—রে মন! তুমি কাহার শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি তোমার মনে নাই? তোমার কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই, তুমি সমস্ত সংশয় দূর কর—সমস্ত ভাবনা ত্যাগ কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই। প্রতি দুর্ব্বলতায়, প্রতি কর্ম্মে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর। সকল কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম দ্বারা উপাসনা করিও।

দেখা গেল, ক্রম অনুসারে উপাসনা, যোগ, ভক্তি, সাংখ্যজ্ঞান এবং সমাধি-ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, আত্মদর্শন হয়, জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। যিনি ভগবান্ আত্মার দর্শনলাভ করিতে পারিতেছেন না, তিনি নিরন্তর ধ্যানযোগ অভ্যাসে, আত্মদর্শনার্থ আপনাকে উপযোগী করিবেন। ধ্যানে থাকিতে না পারিলে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ সাহায্যে আত্মসংস্থ হইতে হইবে, ইহাও না পারিলে উপাসনা দ্বারা যোগ, ভক্তি ধ্যান-যোগ-সৌধে ক্রম অনুসারে আরোহণ করিয়া আত্মজ্ঞান ও আত্মদর্শন লাভ করিতে হইবে, ইহাই মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শ্রুতির উপদেশ মত গীতাশাস্ত্রও জীবকে এইরূপে মুক্তি পথে লইয়া যাইতেছেন।

গীতাও বলিতেছেন—জীব, তুমি জীবন্মুক্তির জন্য পুরুষার্থ কর, অর্জ্জুন, রক্ষণের ভার তোমার আশ্রয়দাতাই গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্ভয় হইয়া, সাধনা করিতে থাক, তুমি পারিবেই। জীব “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত”। এই কার্য্যের জন্য উঠ; আনন্দধামে স্থিতিই তোমার লক্ষ্য।

লয় বিক্ষেপ পীড়া জন্মায়, ইহা তোমার পূর্ব্ব দুষ্কৃতির পরিচয়। সাধক! ইহাতে হতাশ হইও না।

“ত্যজন্ত্যুদ্যমমুদ্যুক্তা ন স্বকর্ম্মণি কেচন।”

কোন উদ্যোগশীল পুরুষ স্বকর্ম্মে উদ্যোগ ত্যাগ করে না।

যাহা কল্য করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা অদ্যই সম্পাদন করিবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

"শ্বঃকার্য্যমদ্যকর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবাঽকৃতম্॥"

প্রতিদিনের কার্য্যে লয়বিক্ষেপরূপ প্রাক্তন অশুভ যতক্ষণ না কাটাইতে পার, ততক্ষণ পুরুষার্থ প্রয়োগ করিবে।

"তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যং সুপৌরুষম্।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ম্॥"

যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

"দোষঃ শাম্যত্যসন্দেহং, প্রাক্তনোঽদ্যতনৈর্গুণৈঃ।
দৃষ্টান্তোঽত্র হ্যস্তনস্য দোষস্যাদ্যগুণৈঃ ক্ষয়ঃ॥"

লয়বিক্ষেপরূপ পূর্ব্বকর্ম্মদোষ, প্রত্যহ পুরুষার্থ-প্রয়োগে বিনাশ করিতে হইবে। ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের উৎসাহবাক্য। মানুষের এ সামর্থ্য আছে। দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া আলস্য, অনিচ্ছা, অনুদ্যম, ত্যাগ করিতে হইবে। "বুদ্ধি ও শাস্ত্র সহকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহা সিদ্ধ করা যায় না, এমন কার্য্যই নাই"। যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ২৯৭ সর্গ।

"অসদ্দৈবমধঃ কৃত্বা নিত্যমুদ্রিক্তয়া ধিয়া।
সংসারোত্তরণং ভূত্যৈ যতেতাধাতুমাত্মনি॥ ৫।১৩ মুমু ক্ষোঃবাঃ
ন গন্তব্যমনুদ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষগর্দ্দভৈঃ।
উদ্যোগস্তু যথাশাস্ত্রং লোকদ্বিতয়সিদ্ধয়ে॥" ১৪। ঐ

আপন উদ্যোগশীল বুদ্ধি দ্বারা যাহা যাহা করিতে হইবে—তাহার আলোচনা কর, দৈব অধঃকৃত হইয়া যাইবে, পুরুষার্থ জাগিবে, তখন সংসারোত্তরণ জন্য একদিকে মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি কার্য্যে লাগিয়া যাও, অন্য দিকে শান্তমন ও শান্ত ইন্দ্রিয়কে আপন প্রিয় আত্মাতে লাগাইয়া দাও—সংসার উত্তীর্ণ হইবে।

পুরুষগর্দ্দভের মত উদ্যোগহীন হইও না। শাস্ত্রানুযায়ী উদ্যোগ ইহলোক এবং পরলোক, উভয় লোকের উপকারী।

"অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থকর্ত্তৃ বলবৎ তত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥"

যথায় শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্ট-জনক পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম তোমার প্রবল। তখন অতিদৃঢ়ভাবে প্রবল পুরুষার্থ দেখাইবে। জীবন যায় যাক্, আমি এই শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবই, স্থির করিয়া দন্তে দন্ত বিচূর্ণ করিতে করিতে কর্ম্মে লাগিয়া পড়িতে হইবে। ইহাতেই ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম আমাকে দুঃখে নিপাতিত করিতেছে—ইহা মূঢ়ের উক্তি মাত্র। ভগবান্ পুরুষকার-রূপে সকলের মধ্যেই আছেন। গীতা বলিতেছেন—"পৌরুষং নৃষু"। পূর্ব্বকর্ম্মফলে যাহা হয় হউক, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঐহিক পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা "পুরুষগর্দ্দভ" হইয়া যাইবে। "আমার অদৃষ্টে ছিল, হইতেছে" ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর করিয়া নিপাতিত করিতে হইবে, ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠের অভিপ্রায়। কারণ, তিনি বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নিকট উল্লিখিত বুদ্ধির প্রাবল্য নাই।

ভগবান্ বশিষ্ঠ, পুরুষকারকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। গীতাও তাহাই বলিতেছেন। "মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই প্রবল পুরুষার্থ। স্বভাব-বশে সংসার করা পুরুষার্থ নহে। উন্মত্ত সাধারণলোক যাহাকে 'দৈব' বলে তাহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে পুরুষার্থ মাত্র।

"সাধূপদিষ্ট-মার্গেণ যন্মনোঙ্গ-বিচেষ্টিতম্।
তৎ পৌরুষং তৎ সফলমন্যদুন্মত্তচেষ্টিতম্॥" ৪।১১ মুমু য়োঃবাঃ

সাধুগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, তাহাই সফল। অন্য পুরুষকার উন্মত্তচেষ্টা মাত্র।

"দৈবং পুরুষকারেণ যো নিবর্ত্তিতুমিচ্ছতি।
ইহ বাঽমুত্র জগতি স সম্পূর্ণাভিবাঞ্ছিতঃ॥"

যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈব নিবারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ইহ-লোক ও পরলোকে সম্পূর্ণ অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়েন।

"যে সমুদ্যোগমুৎসৃজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থং কামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥"

যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট হয়, সেই আত্ম-বিদ্বেষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে বঞ্চিত হয়।

এই জগতে যে যেখানে প্রকৃত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পুরুষার্থ বলেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

"পুরুষার্থেন দেবানাং, গুরুরেব বৃহস্পতিঃ।
শুক্রো দৈত্যেন্দ্রগুরুতাং পুরুষার্থেন চাস্থিতঃ॥
দৈন্যদারিদ্র্যদুঃখার্ত্তা, অপি সাধো নরোত্তমাঃ।
পৌরুষেণৈব যত্নেন যাতা দেবেন্দ্রতুল্যতাম্॥"

বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্য্য পুরুষকার-বলে দৈত্যগুরু হইয়াছেন। হে সাধো! প্রযত্নশালী কত শত মনুষ্য, দৈন্যদারিদ্র্য-দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকার বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়াছেন।

"বিশ্বামিত্রেণ মুনিনা দৈবমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং রাম নান্যথা॥
অস্মাভিরপরৈ রাম, পুরুষৈ র্মুনিতাং গতৈঃ।
পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তা চিরং গগনগামিতা॥"

বিশ্বামিত্র মুনি, একমাত্র পুরুষকার-বলেই দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অন্য কোনপ্রকারে নহে। আমরাও পৌরুষ বলে মুনি হইয়াছি ও এই ত্রিভুবনমধ্যে বহু সময় ব্যাপিয়া আকাশ-গমন করিতে শিখিয়াছি।

"উৎসাদ্য দেব-সঙ্ঘাতং চক্রুস্ত্রিভুবনোদরে।
পৌরুষেণৈব যত্নেন সাম্রাজ্যং দানবেশ্বরাঃ॥"

দৈত্যগণ পৌরুষবলেই দেবসমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে সাম্রাজ্য করিয়াছে। আবার—

"আলূনশীর্ণমাভোগি জগদাজহ্রুরোজসা।
পৌরুষেণৈব যত্নেন দানবেভ্যঃ সুরেশ্বরাঃ॥"

দেবগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ এবং বিশাল জগত আহরণ করিয়াছিলেন।

পৌরুষ অবলম্বন কর, জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, এই জগতের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

"যো যো যথা প্রযততে স স তত্তৎফলৈকভাক্।
ন তু তূষ্ণীং স্থিতেনেহ কেনচিৎ প্রাপ্যতে ফলম্॥
শুভেন পুরুষার্থেন শুভমাসাদ্যতে ফলম্।
অশুভেনাঽশুভং রাম যথেচ্ছসি তথা কুরু॥"

যে যে লোকে যেমন যেমন পুরুষার্থ করে, তাহারা সেই সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল লাভ হইবে? শুভ পুরুষকারে শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পৌরুষে (উন্মত্ত চেষ্টায়) অশুভ ফল লাভ হয়। হে রাম! তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিতে পার।

দৈব কাহাকে বলে, তাহার বিচার না করিয়াই লোকে নানাপ্রকারে বিপদে পড়ে। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

"পুরুষার্থাৎ ফলপ্রাপ্তির্দেশকালবশাদিহ।
প্রাপ্তা চিরেণ শীঘ্রং বা যাসৌ দৈবমিতি স্মৃতা॥
ন দৈবং দৃশ্যতে দৃষ্টং ন চ লোকান্তরে স্থিতম্।
উক্তং দৈবাভিধানেন স্বর্লোকে কর্ম্মণঃ ফলম্॥"

দেশকালবশেই পৌরুষবলে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, যে ফল তাহাকেই দৈব বলে। দৈব কিন্তু চক্ষে দেখা যায় না, লোকান্তরেও নাই, স্বর্গে যে কর্ম্মফল ভোগ করা যায়, তাহাই দৈব শব্দে কথিত। বশিষ্ঠদেবের মত এই যে—

"পুরুষো জায়তে লোকে বর্দ্ধতে জীর্যতে পুনঃ।
ন তত্র দৃশ্যতে দৈবং জরাযৌবনবাল্যবৎ॥
অর্থপ্রাপককার্য্যৈকপ্রযত্নপরতা বুধৈঃ।
প্রোক্তা পৌরুষশব্দেন সর্ব্বমাসাদ্যতেঽনয়া॥"

পুরুষ এখানে জন্মিতেছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, জরাগ্রস্ত হইতেছে, কিন্তু এখানে জরা যৌবন বাল্যের ন্যায় দৈবের প্রত্যক্ষতা ত হয় না।

পরমার্থসাধক কার্য্যে যত্নপরতাকেই পুরুষার্থ বলে। এই পুরুষার্থেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সংবিৎস্পন্দ, মনঃস্পন্দ, ইন্দ্রিয়স্পন্দ এই তিনটি পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদয় হয়। সংবিৎস্পন্দ তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ, মনঃস্পন্দ পুরুষার্থ-সাধনেচ্ছা, অঙ্গস্পন্দ—অঙ্গচালনার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞান জন্য শাস্ত্রীয় উপায়ে মন ও শরীর চালাইতে হইবে। ব্যায়ামও শাস্ত্রমত করা আবশ্যক। উপাসনা, পূজা, ঈশ্বরসেবা নিজের ইচ্ছামত করিলে চলিবে না—কারণ, নিজের চিন্তাকে শাস্ত্রচিন্তার দিকে প্রধাবিত করিলেই বুদ্ধির দোষ কাটিয়া যায়, নতুবা আপন মনে চিন্তা করিয়া পুস্তক প্রণয়নে কোন ফল নাই। ইহাতেই নানা মতের সৃষ্টি হয়, জীবন্মুক্তি এবং প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত তত্ত্বের পথ আবৃত হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"সংবিৎস্পন্দো মনঃস্পন্দ ঐন্দ্রিয়স্পন্দ এব চ।
এতানি পুরুষার্থস্য রূপাণ্যেভ্যঃ ফলোদয়ঃ॥"

এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"যথা সংবেদনং চেতস্তথা তৎস্পন্দমিচ্ছতি।
তথৈব কায়শ্চলতি তথৈব ফলভোক্তৃতা॥"

কি সুন্দর উপদেশ! চিত্তে যেমন যেমন বিষয়স্ফূর্ত্তি হইবে, চিত্তের স্পন্দনও সেইরূপ হইবে, শরীরচেষ্টাও সেইরূপ হইবে, কাজেই ফলভোগও তদনুরূপ। মন্দ চিন্তা কর, চিত্ত মন্দভাবে স্পন্দিত হইবে, শরীরচেষ্টাও বিকৃত ভাবে চলিবে। কাজেই রোগ শোক আধি ব্যাধি আসিবেই।

"আবাল্যমেতৎ সংসিদ্ধং, যত্র যত্র যথা যথা।
দৈবন্তু ন কচিদ্দৃষ্টমতো জগতি পৌরুষম্॥"

বাল্যাবধি যে যে বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র পৌরুষই বিদ্যমান।

যদি এতদিনও কিছু না করিয়া থাক, এখন হইতে শাস্ত্রমত চলিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাক। তোমার দুরদৃষ্ট দূর হইবে—অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্দ কর্ম্মও চেষ্টা দ্বারা যে মন্দ স্বভাব বা দুর্দৈব বা কুপুরুষকার হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। কিন্তু উদ্যম কখনও ত্যাগ করিও না। তোমার

হইবেই। একবার বিফল-মনোরথ হইতেছ, দুইবার হইতেছ, কি তিনবার হইতেছ, ইহাতে নিরুৎসাহ হইও না। শাস্ত্র বলিতেছেন, ঠিক শাস্ত্রমত চলিতে থাক, যতক্ষণ না হয়, চেষ্টা কর—হইবেই নিশ্চয়। শাস্ত্র বলিতেছেন।—

শাস্ত্রতো গুরুতশ্চৈব, স্বতশ্চেতি ত্রিসিদ্ধয়ঃ।
সর্ব্বত্র পুরুষার্থস্য, ন দৈবস্য কদাচন॥

শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ও নিজের অনুভব, এই তিনের মিলন কর, পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবেই; ইহাতে দৈবের কোন প্রয়োজন নাই। বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য যে জাতি গ্রহণ করিবে, সেই জাতি একদিকে জীবন্মুক্তি অন্যদিকে জগতের অভ্যুদয় সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

রে পাপী দুর্ব্বল জীব! বশিষ্ঠ বাক্য হৃদয়ে ধারণ কর,

"হ্যস্তনী দুষ্ক্রিয়াভ্যেতি শোভাং সংক্রিয়য়া যথা।
অদ্যৈবং প্রাক্তনী তস্মাৎ যত্নাৎ সৎকার্য্যবান্ ভবেৎ॥"

যেমন, পূর্ব্বতন কুকার্য্য সৎকর্ম্ম দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়, প্রাক্তন কর্ম্মও সেইরূপ শুভে পরিণত হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য, গুরু-বাক্য ও আপন অনুভব মিলাইয়া কার্য্য করিতে থাক। এই তিনটির কোন একটি বাদ দিলে তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। শুধু গুরুবাক্য যদি শাস্ত্রবাক্যের সহিত না মিলে, তবে গুরু ঈশ্বরপথে চলিতেছেন না নিশ্চয়, আর যদি শাস্ত্র-লিখিত শ্লোক সদ্‌গুরুবাক্যের সহিত মিলিত না হয়, তবে উহা শাস্ত্র নহে, মূর্খ লোকের উক্তি মাত্র, কোনরূপে শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই যোগবাশিষ্ঠ, এই গীতা, এই অধ্যাত্ম রামায়ণ, এই মহাভারত, এই ভাগবত, এই চণ্ডী, ইঁহারা একই উপদেশ দিতেছেন, ইঁহারা শ্রুতিবাক্য মাত্রই সমর্থন করিতেছেন। যেখানে বিরোধমত বোধ হয়, সেখানে অগ্র পশ্চাৎ তুমি দেখিতেছ না, তাই বিরোধ। অগ্রপশ্চাৎ মিলাইয়া দেখ, দেখিবে, ভগবান্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস, শঙ্কর, এক কথাই বলিতেছেন। ইঁহাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা যিনি করেন, তিনিই জীবের অনিষ্ট করেন। এইজন্য সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরু একান্ত আবশ্যক। সৎশাস্ত্রই ঈশ্বরবাক্য, সদ্‌গুরুই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আশ্রয় কর "মামেকং শরণং ব্রজ", তুমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবই শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ দেখিয়া সংশয় সৃষ্টি করে, ইহা ইহাদের বিচারের দোষ! ব্যাসদেব এবং বশিষ্ঠদেব এইরূপে দৈব ও পুরুষকারের সমন্বয় করিয়াছেন। প্রকৃত

পুরুষকার ঈশ্বর-লাভ জন্য চেষ্টা মাত্র। সংসারকার্য্যের চেষ্টাকে পুরুষকার বলে না—ইহা উন্মত্তচেষ্টা মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার জীবের স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছে—এই স্বভাব আপনা হইতে বিষয়ের দিকে চলিবেই, ইহার জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কাম, ক্রোধ, বিষয়-আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য—ইহাদের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুচেষ্টার ফলে আপনারাই কার্য্য করে। চেষ্টা কেবল ঈশ্বরলাভ জন্যই করিতে হয়—ইহাই পুরুষার্থ। সংসার চেষ্টাই যাহার সর্ব্বস্ব, ঈশ্বরলাভ-চেষ্টা-সময়ে যে বলে, "যখন সময় হইবে তখন করিব" সেই রূপ মূঢ়-বুদ্ধি মনুষ্য আপনিও নষ্ট হয়, অন্যকেও নাশের সদুপদেশ প্রদান করে। ঈশ্বরকে ডাকিবার সামর্থ্য সকল মনুষ্যের সকল কালেই আছে, ইহা আমরা "অপিচেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি গীতার শ্লোক হইতে দেখিয়াছি।

বশিষ্ঠদেব আবার বলিতেছেন—

"মূঢ়ানুমানসংসিদ্ধং, দৈবং যস্যাস্তি দুর্ম্মতেঃ।
দৈবাদ্দাহোঽস্তি নৈবেতি, গন্তব্যং তেন পাবকে ॥"

যে দুর্ম্মতি, মূঢ়ব্যক্তির অনুমান-সিদ্ধ দৈব মানিয়া থাকে, তাহার "অগ্নিতেও দৈবাৎ দগ্ধ হইব না" এই স্থির করিয়া অগ্নিতে পড়া উচিত।

"দৈবমেবেহ চেৎ কর্ত্তৃ পুংসঃ কিমিব চেষ্টয়া।
স্নানদানাসনোচ্চারান্ দৈবমেব করিষ্যতি ॥
কিংবা শাস্ত্রোপদেশেন, মূকোঽয়ং পুরুষ, কিল ।
সঞ্চার্য্যতে তু দৈবেন কিং কস্যেহোপদিশ্যতে ॥"

এই জগতে দৈবেরই যদি কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই কেন স্নান, দান, উপবেশন, মলত্যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম করুক না? শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? দৈবই সকল কর্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক।

এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সত্য যে, সকল বিষয়েই যত্নের আতিশয্য থাকিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল প্রকার অভিলষিতই সফল হয়। শুভ উদ্যম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নন্দী, বলি, সম্বর্ত্ত বিশ্বামিত্র, উপমন্যু, শ্বেতনামক মুনি, পতিব্রতা সাবিত্রী, ইঁহারা উদ্যমশীল হইয়াই অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। জগতে এমন কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না যিনি অতিশয়

শুভ উদ্যোগ করিয়াও ফললাভ করেন নাই। এজন্য আত্মজ্ঞান বিষয়েই দৃঢ় উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কদাচ কোন উপায়ে জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের উপশম হয় না— অন্য কোন উপায়ে জীবন্মুক্তি হইতে পারে না।

শাস্ত্রে যেখানে দৈবের কথার উল্লেখ আছে এবং দৈবের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মূঢ়জনের বুদ্ধি-গ্রাহ্য নিশ্চেষ্টভাব নহে—ইহার নাম মহা-নিয়তি। এই মহানিয়তি ব্রহ্মের চিৎশক্তি। ইহা স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী। এই মহানিয়তি আদি সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মকবৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত হয়। ঐ মহানিয়তিবলে ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎসমূহ তৃণের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই মহানিয়তি সর্ব্বকালগামী ও সকল বস্তুব্যাপী। ইহার সহিত মোহের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা বিশুদ্ধ ঈশ্বরসঙ্কল্প। এই মহানিয়তিকে জ্ঞানিগণ "দৈব" নাম দিয়া থাকেন। "এই পদার্থ এই প্রকার স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই প্রকারে, এই সময়ে, উৎপন্ন হইবে" ইত্যাকার অবশ্যম্ভাবিতাকে দৈব কহে। ইহাকেই পুরুষস্পন্দ, নিখিল তৃণগুল্মাদি, সমুদায় জীব, দিবারাত্র্যাদিকাল ও ক্রিয়া বলা হয়। এই নিয়তিবলে পুরুষাদৃষ্টের সত্তা এবং পুরুষাদৃষ্টদ্বারা এই নিয়তির সত্তা, ত্রিভুবনের অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। তাহার পর মহাপ্রলয় হইলে পুরুষাদৃষ্ট ও এই নিয়তি এক আত্মারূপে অবস্থিত হয়। কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষ-ক্রিয়ামূলক যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, তৎসমুদায় এই নিয়তিবশেই হইয়া থাকে। এই অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি দ্বারা যাহা হইবে, তাহা রুদ্র প্রভৃতিগণেরও বুদ্ধিদ্বারা লঙ্ঘনীয় হয় না। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি এই নিয়তি আশ্রয় করিয়া পুরুষকার ত্যাগ করিবেন না। কারণ, নিয়তি পুরুষকার আকারেই কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হয়। এই নিয়তি যখন পুরুষ-প্রযত্নে মিলিত না হয়, ঈশ্বরসঙ্কল্প মাত্রেই অবস্থিত হয়, তখন সে নিয়তি-পদবাচ্য হয় এবং যখন সৃষ্টিফল-সম্পৃক্ত হয়, তখন তাহাকে পুরুষকার কহে। অতএব পুরুষকাররূপে পরিণত না হইলে নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয় না। পুরুষকারে পরিণত হইলেই নিয়তি সফল হয়। যে ব্যক্তি নিয়তি আশ্রয় করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রাণবায়ুস্পন্দ কোথায় যাইবে? অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইলেও, নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করায় যখন কেহ ক্ষণকাল জীবিতও থাকে, তখন তাহারও প্রাণবায়ু সঞ্চালনের অনুকূল যত্ন ও পুরুষকার থাকে। যখন তাহার অভাব হয়, তখন তাহারও অভাব হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থলে যে ব্যক্তি প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া চিত্ত-বিশ্রাম-পদে অবস্থান করে

এবং সেই সাধু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ যে সকল পৌরুষের ফলস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাও তাহার প্রাণরোধাদিরূপ পুরুষকারের ফল, সুতরাং "পুরুষকার ব্যতীত ফল," ইহা কিরূপে বলা যাইবে? অতএব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরুষকার অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। জ্ঞানীদিগের নিয়তিতে কোন দুঃখের লেশ নাই। উহাতে অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। এই নির্দুঃখ নিয়তিরূপ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণে যদি পরিণত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই পরমশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্তি ও পরম গতিলাভ, জানিবে। যেমন জলেরই দ্রবত্ব, তৃণ লতা বৃক্ষ প্রভৃতিরূপে ধরাতলে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বগামী ব্রহ্মই উক্তপ্রকার নিয়তি বিভাগে স্ফুরিত হয়েন। এই কঠিন তত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি-প্রকরণের ৬২ অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

উপরে দেখান হইল—পুরুষকারবলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও বুদ্ধিমান্ এই যে তিন প্রকার মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে মূর্খেরাই পুরুষকার স্বীকার করে না। আর যাহারা পুরুষকার স্বীকার করে, মনে মনে কামনা করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মদ্বারা তাহা সাধন না করে, তাহাদের ব্যবহার উন্মত্তের ক্রীড়া মাত্র।

"চিত্তে চিন্তয়তামর্থং যথাশাস্ত্রং নিজেহিতৈঃ।
অসংসাধয়তামেব মূঢ়ানাং ধিগ্‌দুরীপ্সিতম্॥" মু ৫।২২

যে সকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া যথাশাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাহাদিগের ইষ্ট ভোগলিপ্সায় ধিক্। ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে "যাতি নিষ্ফলযত্নত্বং ন কদাচন কশ্চন"। শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রযত্ন কখনই নিষ্ফল হয় না, দৈবপরায়ণ সেই সেই ব্যক্তিই দীন হীন পামর ও মূঢ়, যাহারা লোভ-পরবশ হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মের জয়ার্থ যত্ন করে না। কিন্তু

পৌরুষেণ কৃতং কর্ম্ম দৈবাদ্ যদভিনশ্যতি।
তত্র নাশয়িতুর্জ্জ্ঞেয়ং পৌরুষং বলবত্তরম্॥ মু ৬।৭

যথায় পুরুষকার-কৃত কর্ম্ম দৈবাৎ বিফল হয়, তথায় বুঝিবে, সেই কর্ম্মনাশক ব্যক্তির পুরুষকার আরও প্রবল হওয়া উচিত।

"যদ্ যদভ্যস্যতে লোকে তন্ময়েনৈব ভূয়তে।
ইত্যাকুমারং প্রাজ্ঞেষু দৃষ্টং সন্দেহবর্জ্জিতম্॥"

এই জগতে যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাতেই তন্ময় হওয়া যায়—ইহার পরিচয় আবাল-বৃদ্ধে জ্ঞাত আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যান্ত গুরু, শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা নির্ণীত কর্ম্ম অভ্যাস কর, হইবেই।

যাহারা জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়াও তল্লাভে পৌরুষ প্রদর্শন না করে, তাহারাই প্রকৃত মূর্খ।

"বরং শরাব-হস্তস্য চাণ্ডালাগারবীথিষু।
ভিক্ষার্থমটনং রাম ন মৌর্খ্যহত-জীবিতম্॥" মু ১৩।১৭

বরং শরাব-হস্তে চণ্ডালভবনরথ্যায় ভিক্ষা করিতে যাওয়া ভাল, কিন্তু মূর্খতা-দূষিত জীবন কিছু নহে।

আর মুক্তির পথ জানিয়াও

"সম্ভোগাশনমাত্রেণ রাজ্যাদিষু সুখেষু যে।
সন্তুষ্টা দুষ্টমনসো বিদ্ধি তানন্ধদর্দ্দুরান্॥"

যাহারা রাজ্যাদি সুখসম্ভোগমাত্রেই সন্তুষ্ট, সেই দুষ্টাধমগণকে অন্ধ ভেক-স্বরূপ জানিবে।

অধিক আর কি বলা যাইবে—আত্মদর্শনে সচেষ্ট হও, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হও আর বিলম্ব করিও না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইহা স্মরণ রাখিয়া, যে পাপী মোক্ষলাভার্থকর্ম্মে ভীত হইয়া ভোগরসে আসক্ত হয়, সেই অধম নিজ মাতার বিষ্ঠার ক্রিমিতুল্য—সেই অধমগণের নাম কীর্ত্তনীয় নহে—

"এতাবত্যপি যে ভাতাঃ পাপা ভোগরসে স্থিতাঃ।
স্বমাতৃবিষ্ঠাক্রিময়ঃ কীর্ত্তনীয়া ন তেঽধমাঃ॥"

শাস্ত্র শক্তি সঞ্চার করিতেছেন—তুমি আপন লক্ষ্যও স্থির করিয়াছ, এক্ষণে প্রবল পুরুষার্থ-সহকারে কর্ম্মে নিযুক্ত হও।

উত্তম প্রবল রাখিবার জন্য প্রতিদিন বিচার করিও—দেহ নশ্বর, স্ত্র্যাদি ভোগ, কীটের ব্রণাস্বাদন-ন্যায়; লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারমত কর্ম্ম, উন্মত্ত

চেষ্টা মাত্র। অন্য কর্ম্ম যখন তোমায় করিতে হয়, তখনও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মোক্ষ-প্রাপক কর্ম্ম ভিন্ন সকল কর্ম্মই মিথ্যা। মিথ্যা বোধে যদি কখন কোন কর্ম্ম কর, তবে তোমার প্রকৃত কর্ম্মের ক্ষতি হইবে না।

আমরা উপসংহারে এইমাত্র বলি যে, শ্রীভগবান্ আশ্রয় দিলেন, তিনি শাস্ত্রমুখে, সাধুমুখে, গুরুমুখে পথ দেখাইয়া দিলেন। জীব! আর তোমার ভয় কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া আনন্দধামে শুভযাত্রা কর। প্রবল উদ্যমে পথ অতিক্রম করিতে থাক, শরীরের দিকে, ভোগের দিকে, আর চাহিও না। কোথাও সন্দেহ হইলে, ভগবান্ আত্মাকেই জিজ্ঞাসা কর; তিনিই তোমার পথ-প্রদর্শক; গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য তাঁহারই বাক্য। তুমি অধ্যবসায় কর, নিশ্চয়ই আনন্দধামে যাইতে পারিবে, নিশ্চয়ই এই জন্মেই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। ভাবিও না যে, এই ঘোর কলিযুগে জীবন্মুক্তি অসম্ভব কথা—

"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥"

টীকাকার বলিতেছেন,—"ননু শুকাদীনাং শমদমাদিসাধনসম্পন্নানাং শ্রবণং ফলিতং কথমস্মেষামাধুনিকানাং তৎ ফলিষ্যতি, সাধনানাং দুঃসম্পাদত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষপ্রযত্নস্যাসাধ্যং নাস্তীত্যাহ সর্ব্বমেবেতি।"

ভাগবতাদি শাস্ত্রে এবং অধ্যাত্ম-রামায়ণাদিতেও জীবন্মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কলির জীবেরই জন্য। গীতায় যাহা সূত্র মাত্র, অন্য অন্য শাস্ত্রে তাহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; সেই জন্য আমরা এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যেখানেই আসি না কেন, বিনা জীবন্মুক্তিতে কাহারও দুঃখনিবৃত্তি নাই। জীবন্মুক্তি সুখের জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই অংশ শেষ করা গেল।

"পরিস্পন্দঃ শাস্ত্রবিহিতং কায়বাক্‌চিত্তচলনরূপং কর্ম্ম তস্য ফলং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানং তৎপ্রাপ্তৌ সত্যাং হৃদি শীতলং কামক্রোধাদিসন্তাপাপ্রতিহতমাহ্লাদনং জীবন্মুক্তিসুখমুদেতি।" তথাচ শ্রুতিঃ—

"স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্যেতি।"

স্মৃতিশ্চ—"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলা"-মিতি॥

"তত্ত্ সর্ব্বং পৌরুষাদেব ভবতি নান্যত ইতি পুরুষপ্রযত্ন এব নির্ভরঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ।" যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার উপরি উক্ত কথা বলিতেছেন তাহা এই—

"ইহ হীন্দোরিবোদেতি শীতলাহ্লাদনং হৃদি।
পরিস্পন্দফলপ্রাপ্তৌ পৌরুষাদেব নান্যতঃ॥"

শীতল কামক্রোধাদি সন্তাপ দ্বারা অপ্রতিহত যে আহ্লাদকে জীবন্মুক্তি বলে, জীব সেই জীবন্মুক্তির জন্য পুরুষার্থ না করিয়া কোন্ ভূতের কার্য্যে জীবন ব্যয় করিতেছে? আর বিলম্ব করিও না, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।

পঞ্চম কথা।

গীতার স্থূল পরিচয়।

১। ভগবান্ ব্যাসদেব শত সহস্র (১০০+১০০০) বা লক্ষ শ্লোকে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী গীতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের অংশ। যতগুলি শ্লোকে গীতা গ্রথিত তাহার তালিকা। একটি শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি, ৪০টি সঞ্জয়ের, ৮৪ট শ্লোক অর্জ্জুনের, এবং মহাভারতে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই;—ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ। অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে,—"ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" ইত্যাদি। গীতার স্থূল পরিচয় গীতাই দিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ, ইহা যোগশাস্ত্র, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা উপনিষদ্।

২। গীতা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ। গীতার শেষ কয়েকটি শ্লোকে সঞ্জয় এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

গীতার অদ্ভুত সংবাদ, গীতার অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ—কখনও কি স্মরণ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, সাধনায় বসিবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইও, দেখিবে—স্মরণে চিত্ত কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়।

সঞ্জয় বলিতেছেন—আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই পরমগুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাস-প্রসাদে শ্রবণ করিলাম। কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে রাজন্-শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করিতেছি।

সত্যই কি এক অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার এই কৃষ্ণার্জ্জুন-কথায় সন্নিবেশিত, কি এক অদ্ভুত বিশ্বরূপ এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত!! যদি এই অদ্ভুত সংবাদ, এই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে, যদি ইহার স্মরণে মুহুর্মুহুঃ হর্ষ না আইসে, তবে গীতা-পরিচয়ে ফল কি?

সঞ্জয়ের ত মুহুর্মুহুঃ হর্ষ আসিয়াছিল, আমাদের আসে না কেন? কারণ আছে। পুস্তকে উপদেষ্টার স্বর আঁকা থাকে না, সে স্নেহদৃষ্টি থাকে না, সে মধুর হাস্য থাকে না, সে সুন্দর হস্তভঙ্গী থাকে না। নির্জীব গ্রন্থ কথাগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে; যাহার কথা, সে যেমন করিয়া বলিয়াছিল, পুস্তক সে প্রকারটি দিতে পারে না। কিন্তু যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন, সেই হাসি, সেই ভঙ্গী, সেই ত্রিভঙ্গললাম ঠাম, সেই স্নেহভরা চাহনি, সেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত, যে ভক্ত আপন মানসচক্ষে সেই ভরা-রূপের আভাসও প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই ধন্য! তিনিই সেই বিশ্বরূপ স্মরণে সেই রূপজড়িত বাক্যে পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করেন। এ হর্ষ অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভূত হয়, এ আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়, স্বর গদ্‌গদ্ হইয়া যায়, কতই সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। গীতার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সাত্ত্বিক বিকার যদি প্রবর্টিত না হয়, তবে গীতার অনুভূতি যেন ঠিক হয় না। কোন কিছু গ্রহণ করিয়া যদি রসে উপস্থিত না হওয়া যায়, তবে বুদ্ধির ক্ষণিক তৃপ্তি বা চিত্তবিনোদন পর্য্যন্তই লাভ হয়। ভগবানের রূপের সহিত ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ কর, আনন্দ আসিবেই।

এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ, এই লোমহর্ষণ সংবাদ লইয়াই গীতা। বিশ্বরূপ গ্রন্থ-মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত—ইহা বলিবার কথা নহে, অনুভবের কথা। সংবাদের পরিচয় আবশ্যক।

৩। গীতা যোগশাস্ত্র। ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ প্রকার যোগের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ-যোগ এবং শেষ অধ্যায়ে

মোক্ষ-যোগ। যিনি বিষাদকে যোগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই গীতোক্ত পথে কার্য্য করিয়া সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভে সমর্থ।

এই অষ্টাদশ যোগ, তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে বিষাদ-যোগ, সাংখ্য-যোগ, কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ এবং ধ্যান-যোগ। দ্বিতীয় ষট্‌কে বিজ্ঞান-যোগ, অক্ষরব্রহ্ম-যোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপদর্শন এবং ভক্তি-যোগ। শেষ ষট্‌কে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ, গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগ-যোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ এবং মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ। প্রতি ষট্‌কেই কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের উল্লেখ থাকিলেও প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রতি ষট্‌কেই পরোক্ষ জ্ঞান, সাধনা ও সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত। বেদ যেরূপ কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত, গীতাও তাহাই। ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে ক্রম, শ্লোকে শ্লোকে ক্রম, এমন কি শ্লোকের শব্দে শব্দে ক্রম লক্ষিত হয়। মূলগ্রন্থে শ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয়ে এই ক্রম বুঝিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। অদ্ভুত গ্রন্থ এই গীতা! ধর্ম্মময়ী সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা এই গীতা এই জন্যই এত আদরের বস্তু। গীতা বহু ভাষায় অনূদিত, বহুভাষ্যে অলঙ্কৃত, জগন্মান্য বহু পণ্ডিত আজও ইহার পূজা করেন। গুণ না থাকিলে এত আদর কি হয়? আর—

"সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥"

৪। গীতা ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যার প্রকাশে আপন স্বরূপ অনুভূত হয়, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। যাহারা অবিদ্যার বশবর্ত্তী তাহারা প্রবৃত্তিমার্গ নিরত, আর যাঁহারা বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা "নিবৃত্তিমার্গ-নিরতা বেদান্তার্থ-বিচারকাঃ। তদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ॥" যাঁহারা বেদান্তার্থ-বিচারক, যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহারাই নিবৃত্তিমার্গ-নিরত। ইঁহারাই বিদ্যালাভে সমর্থ। পরমানন্দে নিত্যস্থিতি, ব্রহ্মবিদ্যাই কেবল প্রদান করিতে পারেন। এই পরমানন্দরূপে নিত্যস্থিতিই কৈবল্যমুক্তি। ব্রহ্মবিদ্যার অন্য নাম উপনিষদ্বিদ্যা। মুমুক্ষুগণকে মুক্তি প্রদান করিতে এক একখানি উপনিষদ্‌ই সমর্থ—

মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্ জ্ঞানং দশোপনিষদং পঠ।

গীতা, সমস্ত উপনিষদের সার—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

৫। গীতা উপনিষদ্ কেন? 'উপনিষদ্' অর্থে সমীপসদনম্ (উপ+নি + সদ্+ক্কিপ্)। 'উপ' অর্থে সমীপে, 'নি' অর্থে নিশ্চয়রূপে, 'সদ্' অর্থে অবস্থান—নিশ্চয়রূপে সমীপে অবস্থান, ইহাই উপনিষদের ধাতুগত অর্থ। যে বিদ্যা "তিনি অতি সমীপে অবস্থান করিতেছেন" ইহা নিশ্চয়রূপে অনুভব করাইয়া দেয়, তাহাই উপনিষদ্ বিদ্যা, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।

কে সমীপে অবস্থান করিতেছেন? যিনি সর্ব্বপ্রকার বিষাদের আত্যন্তিক নিবৃত্তিস্বরূপ, যিনি চিরস্থায়ী আনন্দ-স্বরূপ, যাঁহাকে জানিলে—দেখিলে তাহাই হইয়া যাওয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দরূপী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তাই সমীপে। ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভগবান্, ইনিই পরমাত্মা। গীতা এই আত্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে—ইহাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে।

এই ব্রহ্মবিদ্যা, এই উপনিষদ্, এই যোগশাস্ত্র লইয়াই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত ও কর্ম্মসঙ্কেতে এই সংবাদের পরিচয় দেওয়া হইবে। গীতার স্থান, কাল ও পাত্র-বিবৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন-চরিত্রের কতক আলোচনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ কথা।

—:০:—

শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্র।

কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করাই শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্র। আমরা এই প্রবন্ধে সেই রক্ষামন্ত্রগুলির কার্য্যকারিতা দেখাইব।

আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রথমে রক্ষার বিষয় অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতি—ইহাই মানবজাতির স্থূল বিভাগ। ইহা রক্ষাই সৃষ্টিরক্ষা। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর রক্ষার কথা এখানে আলোচিত হইবে না। মনুষ্যরক্ষার কথাই আমাদের আলোচ্য।

(১) মনুষ্য রক্ষা করিতে হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

(২) কর্ত্তব্যের অন্তরায়গুলি দূর করা আবশ্যক।

(৩) কর্ত্তব্যবিমুখকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করা আবশ্যক।

উপস্থিত সময়ে যাঁহারা সভ্যজাতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও কর্ত্তব্য পরিপালনের অন্তরায় দূর করিবার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা লইয়াই ব্যস্ত। শ্রীগীতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখন কর্ত্তব্যবিমুখকে কি উপায়ে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করা যায়, শ্রীগীতা তাহারই শিক্ষা দিতেছেন।

আধুনিক সভ্যজগৎ নিশ্চয় করিতেছেন যে, শিক্ষাই রক্ষার প্রধান উপায়। শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য আত্মাকে উদ্ধার করিতে পারিবে, চিত্তকে সুস্থ রাখিতে পারিবে, বাক্যমল দূর করিতে পারিবে; এবং শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করিতে পারিবে।

উপনিষদাদি—আত্মার উদ্ধার জন্য, যোগশাস্ত্র—চিত্তশুদ্ধির জন্য, ব্যাকরণ শাস্ত্র—বাক্যমল দূর করিবার জন্য, বৈদ্যকশাস্ত্র—শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ইহাই লক্ষ্য করে। পরিবার সমাজ ও জাতি এই কর্ত্তব্যকে

কার্য্যে পরিণত করিবার সহায়তা করিবে এবং কর্ত্তব্য পরিপালনের অন্তরায় অপসারণে প্রাণপণ করিবে।

জাতিগত কর্ত্তব্যও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করিবে, এবং এক শ্রেণীর শিক্ষিত মনুষ্য অন্য শ্রেণীর শিক্ষিত মনুষ্যের সহায় হইবে। যাঁহারা অধিক শক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা করিবেন। যাঁহারা ততদূর শক্তিসম্পন্ন নহেন, তাঁহারা এক বা ততোধিক বিদ্যা প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা করিবেন।

বিষয়গুলি এই ;—(১) ব্রহ্মবিদ্যা, (২) যুদ্ধবিদ্যা, (৩) অর্থকরী বিদ্যা—কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যবিদ্যা, কলাবিদ্যা, শিল্প কারুকার্য্যাদি। ষড়ঙ্গ বেদ সমস্ত বিদ্যার কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আধুনিক শিক্ষার প্রণালী একরূপ, প্রাচীন প্রণালী অন্যরূপ। পার্থক্য এই যে, আধুনিক সভ্যজগতে শিক্ষাব্যাপারে সম্বন্ধে ব্যক্তি ও পরিবারগত স্বাধীনতা আছে। প্রাচীন জগতে শিক্ষা-ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকিলেও, কর্ম্মসম্বন্ধে সেরূপ স্বাধীনতা ছিল না। আরও দেখা যায়, কি শিক্ষা, কি কর্ম্ম, এতৎ সম্বন্ধে উচ্চবর্ণের যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, নিম্নবর্ণের তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না।

উপস্থিত সময়ের শিক্ষামন্দিরে কোন কোন বিষয়ে সকলেরই প্রবেশাধিকার দৃষ্ট হয়—আবার কতক বিষয়ে সকলের অধিকার দেওয়া হয় না। সাধারণ বিষয়ে যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই শিক্ষা করিতে পারে; যাহার যাহা ইচ্ছা, সেইরূপ কর্ম্মও করিতে পারে। নূতন প্রণালীর শিক্ষার একদেশদর্শিতা-বশতঃ মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতেছে না। আমরা স্থূলভাবে মনুষ্যরক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়টি মাত্র উল্লেখ করিলাম। উপস্থিত সময়ের মনীষিগণ মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও কর্ত্তব্যের অন্তরায় দূর করিতে নিযুক্ত থাকুন। আমরা গীতার রক্ষামন্ত্রটি মাত্র এখানে আলোচনা করিতেছি। কারণ, ইহার পালনে সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কর্ত্তব্য যে রূপেই নির্দ্ধারিত হউক না কেন, শ্রীগীতা তাহা উল্লেখ করেন নাই; স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—জীবের কর্ত্তব্য যেন নির্দ্ধারিত হইল; কিন্তু কি উপায়ে কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করা যায়?

কর্ত্তব্যবিমুখকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করার শিক্ষাধিকার সার্ব্বজনীন।

শ্রীগীতা এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য কোন্ কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই আমরা দেখাইব।

প্রথম কথা মনুষ্য কর্ত্তব্যবিমুখ হয় কেন? যাহারা কোন প্রকার কর্ম্ম করিতে চায় না, গীতা তাহাদিগকে তমঃপ্রধান প্রকৃতির মনুষ্য বলিতেছেন। তমঃপ্রকৃতির দোষগুলি গীতা বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐরূপ মানুষের গতি কোথায়, তাহাও দেখাইয়াছেন। গীতাতে গৌণ ভাবে ইহার উল্লেখ আছে। গীতায় মুখ্য কথা,—যাঁহারা কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা রজঃসত্ত্ব প্রকৃতির অথবা যাঁহারা রজঃপ্রবণ প্রকৃতির মনুষ্য, তাঁহারা কি কারণে কর্ত্তব্যবিমুখ হয়েন, প্রথমে তাহারই উল্লেখ করা।

ক্লেশ হয় বলিয়া মানুষ কর্ত্তব্য করে না। ক্লেশের শেষ সীমা মৃত্যু। কর্ত্তব্য পালন জন্য প্রাণ দিতে হইবে। মানুষ প্রাণকে বড় ভালবাসে। অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া মানুষ প্রাণের অনিষ্ট হইল ভাবিয়া বৃথা ভীত হয়। ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্যবিমুখতার কারণ। তবেই দেখা যাইতেছে,—শোকমোহই কর্ত্তব্যবিমুখতার কারণ।

জগতে শোকের অভাব নাই। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখই জগতের স্বরূপ। অজ্ঞান বা মোহ জন্যই এই ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি।

গীতার প্রথম মন্ত্র—দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা কর—যতটুকু জ্ঞান লাভ হইলে দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায়, ততটুকু জ্ঞান প্রথমে লাভ কর। সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; কিন্তু যতদিন তাহা পাইতেছ না, ততদিন দুঃখ সহিয়া, দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কর্ত্তব্য জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে যত্ন কর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর;—ইহাই গীতার প্রথম শিক্ষা; 'তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত' ইহাই প্রথম কথা।

দুঃখ বা শোক উপেক্ষা করিয়া কিরূপে মানুষ জ্ঞান দ্বারা চিরতরে দুঃখ দূর করিতে পারিবে—সর্ব্বপ্রকারে দুঃখশূন্য হইয়া কিরূপে মানুষ পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে, আর জগতে এই শিক্ষা প্রচারিত হইলে কিরূপে মনুষ্যজাতি পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে, শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্রে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শোক নিবারণ—শোকের আত্যন্তিক নিবারণ, ইহাই গীতা-মন্ত্রমালার উদ্দেশ্য।

মন্ত্রের মধ্যে বীজ থাকে, বীজের মধ্যে শক্তি থাকে; আবার বিনা অবলম্বনে শক্তি, থাকিতে পারে না।

গীতামন্ত্রমালাতেও বীজমন্ত্র আছে, বীজমন্ত্রমধ্যে শক্তি আছে, আবার শক্তির একটি অবলম্বন আছে।

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—এইটি বীজমন্ত্র।

এই বীজের শক্তি হইতেছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই শক্তির অবলম্বন হইতেছে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তিই মোক্ষ। যাহা দুঃখ, তাহাই তাপ দেয়। যেখানে তাপ, সেইখানে পাপ। সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিই মুক্তি। এইরূপে মুক্তিই হইতেছে—সর্ব্ব পাপ বা সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি।

আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব, শোক করিও না। সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিদাতা—আমি তোমার আছি। তুমি শোক কেন করিবে? এইটি শক্তির অবলম্বন বা কীলক।

এখন দেখ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়; করিলে বীজের মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহা কার্য্য করিতে থাকে। তখন ঐ শক্তি আপনার অবলম্বন দেখাইয়া দেয়। ঐ অবলম্বন বা আশ্রয়কে দেখিলেই মুক্তিফল লাভ করা যায়।

গীতামন্ত্রমালার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন কর। তোমায় হৃদয়ে বহুবিধ শোক আছে। এ সমস্ত শোকের উৎপত্তি—অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞান কি? অশোচ্য বিষয়ে শোক করাই অজ্ঞান। যাহার জন্য শোক হইতে পারে না, জীব সর্ব্বদা তাহারই জন্য শোক করিতেছে।

শরীরটা নষ্ট হইবে, মৃত্যু হইবে, ইহাই মানুষের প্রধান শোক। ইহাই মানুষের প্রধান অজ্ঞান। মানুষ যখনই শোক করে, তখনই যদি বিচার করিতে পারে—'হে সখে! তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ। হৃদয়ক্ষেত্রে এই বীজ বপন করিলে মনুষ্য দেখিতে পাইবে যে, সে শোক হইতে ভিন্ন পদার্থ। চেতনে শোক নাই, জড়েও শোক নাই। চেতন ও জড় যখন মিলিত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরে যে একটা আরোপ হয়, সেই আরোপহেতু একটা চেতন-জড়াত্মক অহং-ভ্রম ভাসে। সেই ভ্রম-অহংটাই শোক করে।

বলা হইতেছে,—অশোচ্য বিষয়ে শোক করা উচিত নহে। এই বীজের মধ্যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' রূপ শক্তি আছে। সর্ব্বধর্ম্ম অর্থ—সমস্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকৃতির। চেতনের কোন ধর্ম্ম নাই। সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ অর্থ—প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে স্বতন্ত্র, তাহা অনুভব করিয়া প্রকৃতির

ধর্ম্মে উদাসীনবৎ থাকা। সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে সেই একমাত্র যে চেতন পুরুষ অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার শরণ লইতে হয়।

প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ জানিলেও সেই পুরুষ প্রথমে খণ্ড চৈতন্য-রূপে অনুভূত হয়েন। খণ্ড চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যের শরণ লইলে বুঝিতে পারেন যে, উঁহাতেই সর্ব্ব শক্তি রহিয়াছে।

শক্তি আবার শক্তিমান্ ভিন্ন থাকিতে পারে না। আমার শরণাপন্ন হইলে আমি যখন জীবকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকি, তখনই জীব শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। "তরতি শোকমাত্মবিৎ।" আমার কৃপায় আত্মার স্বরূপ দর্শন হইলেই শোকতাপ দূর হয়।

গীতার রক্ষামন্ত্র তবে এই :—

(১) অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং—ইত্যাদি

(২) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—ইত্যাদি

(৩) অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি ইত্যাদি

ভাল করিয়া এই তিনটি বিষয় ধারণা করিলে এবং বহুকাল ধরিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে এই গীতামন্ত্রমালার বীজ, শক্তি ও কীলক (যাঁতার মধ্যদেশে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন) ধারণা করিলে—প্রত্যহ ইহাদের আলোচনা করিলে মুক্তিপথে যে অগ্রসর হওয়া যায়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শঙ্কর ২।১১ শ্লোক হইতে গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং' ইহাই জীবের প্রতি ভগবানের প্রথম উপদেশ। আর 'সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' বলিতে গেলে ইহাই গীতার শেষ উপদেশ। ইহার মধ্যেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির সমস্ত উপায় রহিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্বরূপটিও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যিনি জীবে জীবে আত্মা, তিনিই অবিজ্ঞাতস্বরূপ, নিত্য, সর্ব্বগত, সনাতন, অচল, পরমাত্মা; আবার ইনিই বিশ্বরূপ এবং ইনিই মায়া-মানুষ অথবা মায়ামানুষী। আত্মা কিরূপ? না—

(১) নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

(২) ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

(৩) অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

(৪) নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

(৫) পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।

(৬) নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ইত্যাদি

এই মন্ত্রগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ফেল, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ সর্ব্বানন্দপ্রাপ্তি হইবেই। গীতা-পাঠ-ক্রমে গীতা পাঠের পূর্ব্বে ইহা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। আমরাও বলি, যাহা করা উচিত, তাহা শাস্ত্রবিধিমত করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যহ তিন বেলার নিত্য কর্ম্ম অন্তে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, মন কোন কিছুর জন্য শোক করে কি না? যদি করে দেখা যায়, তবে মনকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোকের কথা ত ধর্ত্তব্যই নহে; কিন্তু 'কেহ মরিয়াছে', বা 'মরিতেছে' অথবা 'মরিবে' ইহার জন্যও যখন মানুষ শোক করে, তখনও শ্রীভগবান্ কেন বলেন, তুমি, যাহা শোকের বিষয় নহে তাহার জন্য শোক করিতেছ।

শ্রীভগবান্ কর্ম্ম অন্তে জীবকে আত্মচিন্তা করিতে বলিতেছেন। আত্মার জন্য শোক হইতে পারে না—ইহা ধারণা করিতে হইলে, আত্মার বিষয় শ্রবণ-মননাদি করা আবশ্যক। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই; আত্মার রোগ শোক নাই; আত্মাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, বায়ুতেও শুষ্ক করা যায় না; আত্মার আহার নিদ্রাও নাই, আত্মার জাগ্রৎ অবস্থা আবার কি? স্বপ্ন সুষুপ্তিই বা কি? এই গুলি যিনি সাধনা দ্বারা সত্য বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনিই শ্রুতির 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' কথার অর্থ জানেন, আর তিনিই শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্র জপ করিয়া মৃত্যু সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

সপ্তম কথা।

—:০:—

গীতার লক্ষ্য সঙ্কেত।

জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স * ইহাই গীতার লক্ষ্য। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই দুইটি শাস্ত্রীয় বাক্য। অভ্যুদয় অর্থে প্রকৃত আনন্দের দিকে জগতের উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স অর্থে পরমানন্দে নিত্যস্থিতি বা মুক্তি। জীব একদিকে জগচ্চক্র আনন্দপথে পরিচালিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে—ইহাই গীতার লক্ষ্য।

মহাপুরুষের লক্ষ্য সর্ব্বদাই জলন্তভাবে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। লক্ষ্যই সর্ব্বদা তাঁহাকে আকর্ষণ করে। মানব জাতির দুঃখ নিবারণ যাঁহার লক্ষ্য, তিনি ক্ষুদ্র সংসার-মমত্বে অভিভূত হইতে পারেন না হৃদয় অন্ধ, বুদ্ধি পথ-প্রদর্শিকা। মহাপুরুষ যদি কখন আপন সতী স্ত্রীর যাতনা বা সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ দুঃখ ভাবিয়া কাতর হয়েন—কাতর হইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার-মায়ায় যদি কখন জগতের দুঃখদুর করিবার সঙ্কল্প শিথিল করেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাকে উত্তেজিত করে, আকাশে নক্ষত্র ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে জগতের দুঃখ দেখাইয়া দেয়। তাঁহার ক্ষণিক অন্ধ হৃদয়, তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মতী বুদ্ধির হস্ত ধারণ করে, তিনি তৎক্ষণাৎ আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এককালে আচরণ করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিতেছেন। নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার সাধন-মার্গের বিশেষত্ব। যথাস্থানে ইহা আলোচিত হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মভাগ, জগতের অভ্যুদয় জন্য এবং নিষ্কামভাব, জীবের নিঃশ্রেয়স জন্য। বিনা কর্ম্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, বিনা কামনাত্যাগে জীবের পরমানন্দে স্থিতি সুদূরপরাহত। শাস্ত্র বলেন—

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত-ব্যবহার-পরোভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥ আঃ রাঃ, উঃ

---

* নিঃশ্রেয়সম্ "আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ" শঙ্কর মিশ্রকৃত বৈশেষিক সূত্রোপস্কার ১।১।২ গীতায় ঈশ্বরবাদ ধৃত।

জগতের অভ্যুদয় ও মানবের নিঃশ্রেয়স এই প্রবন্ধে, আলোচনার বিষয়। প্রথমে জগতের উন্নতির কথা আলোচনা করা যাউক।

জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। গীতা এই জগচ্চক্রের কথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪।১৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে বলিতেছেন—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥"

"যে ব্যক্তি মৎপ্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার আয়ু পাপস্বরূপ। হে পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম পায়, সুতরাং তাহার জীবন বৃথা।"

মনুষ্যের বুদ্ধি অল্প। কোন্ কর্ম্মে জগতের ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, কোন্ কর্ম্মে জগতের জীব সকলে সুখী হইবে, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হয় না, এই জন্য, ভগবান্ কর্ম্মের সহিত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবতার সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধও আছে। মনুষ্য কর্ম্মদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবে, এবং দেবতাগণও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্ন উৎপাদন করিয়া মনুষ্যকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতা ও মনুষ্য পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

কিন্তু জগতের উন্নতি কতদূর সম্ভব? সমস্ত জগতের দুঃখনিবৃত্তি ও সর্ব্বপ্রাণীর পরমানন্দপ্রাপ্তি—ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জগৎ যে কোনও সময়ে সম্পূর্ণ দুঃখশূন্য হইয়াছিল, কোন জাতির ইতিহাসেও ইহা দেখা যায় না। আবহমান কাল হইতে বহু জ্ঞানী জগৎকে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সর্ব্ব প্রাণীর দুঃখনিবৃত্তি কি কখনও হইয়াছে? ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—কিন্তু সকল প্রাণীকে তিনি সাধু করিয়া দিয়া যান না। তিনি, সাধুর বিঘ্ন বিনাশ করেন, সাধুদিগকে নিরাপদ্ করেন—কিন্তু অসাধুও থাকে। সত্য যুগেও অসুর ছিল, স্বর্গেও দৈত্য আছে, রামরাজ্যেও রাক্ষসের দৌরাত্ম্য ছিল, যুধিষ্ঠিরকেও ভ্রাতৃবিরোধে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, আর কলির ত কথাই নাই। যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন পাপপুণ্য উভয়ই থাকিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই চলিবে।

জগতের পূর্ণ সুখের অবস্থা তখন, যখন তত্ত্বজ্ঞানী, সর্ব্বভূতহিতৈষী, হিংসা-লোভ-পরিশূন্য ব্যক্তির উপদেশে মানবজাতি চালিত হয়। যখন অজ্ঞান, ভূত-প্রপীড়ক, হিংসা-লোভ-বিশিষ্ট, "আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"-প্রতিপাদনকারী নৃপতিগণ বা ধর্ম্মরক্ষকগণ বা সমাজ-সংস্কারকগণ মানবজাতির শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হয়েন, তখনই জগতের দুঃখের অবস্থা। জগতের সুখের অবস্থা তখন, যখন পুণ্যের ভয়ে পাপ অন্ধকারে থাকে, জ্ঞানীর ভয়ে অজ্ঞান দমিত থাকে, যখন সদাচারের প্রাবল্যে কদাচার প্রভুত্ব করিতে পায় না, যখন ধর্ম্মের প্রতাপে ধর্ম্মধ্বজিগণ লুক্কায়িত হয়, যখন সতীর তেজে অসতী আর দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না, যখন সতের দৃষ্টান্তে অসৎ আপন পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যখন রাজা বা ধর্ম্মরক্ষক বা সমাজরক্ষক অদূরদর্শী, আত্মসুখান্বেষী, আত্মগরিমা ঘোষণে ব্যস্ত, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়েন; যখন ইঁহারা অহঙ্কারী ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন; যখন ইঁহাদের কুকার্য্যের দৃষ্টান্তে দুষ্টলোকের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মভীরু লোকের সুবিধা হ্রাস পায়, কপটব্যবহার ব্যতীত সংসার চলে না, সরল ব্যবহারে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না; যখন অসাধু কপটী প্রতারকের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, সাধু সরল ব্যক্তি পদে পদে উৎপীড়িত হয়েন; এক কথায়—যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন যিনি সাধুর সাধু, রক্ষকের রক্ষক, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন—তখন ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। ভগবান্ ধর্ম্মবিঘ্ন দূর করেন—সাধু-হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল কৌস্তুভমণির মত জ্বলিতে থাকে; সেই কৌস্তুভালোকে অন্ধকার দূরীভূত হয়, অত্যাচার অন্তর্হিত হয়—ইহাই জগতের রক্ষা, ইহাই জগতের অভ্যুদয়। যখন বহুলোকে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, যখন অধিকাংশ লোকেই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকে, তখনই জগতের প্রকৃত সুখের অবস্থা। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ জগতে হয় না।

কিন্তু মানুষের নিঃশ্রেয়স? মনুষ্য পৌরুষ-সহকারে যত্ন করিলে সীমাশূন্য আনন্দলাভ করিতে পারে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিতে পারে। মনুষ্য, জীবন্মুক্তির অধিকারী। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে—যে, যত্ন করিবে সেই পরমানন্দ লাভ করিবে। এই আনন্দই সকল বস্তুর জীবন। আনন্দের অভাবেই জীবের বিকৃতি। আনন্দের অভাব হইলে কাহারও স্বাভাবিক পরিপুষ্টি হইতে পারে না, জীব ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জীবের প্রয়োজন একমাত্র আনন্দ। আনন্দে চিরস্থিতির নাম মুক্তি; ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি। গীতার প্রথমে বিষাদ-যোগ, শেষে মুক্তিযোগ বা সন্ন্যাসযোগ।

উন্নতির তারতম্যানুসারে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর আনন্দ প্রাপ্তিতে, জীবের রুচি দেখা যায়। সর্কোন্নত জীবের লক্ষ্য, নিত্যানন্দ প্রাপ্তি, ইতর জীব, ক্ষণিক সুখেরই প্রয়াস করে।

ব্যবহারিক জগতের আনন্দ অস্থায়ী। ব্যবহারিক জগতের আনন্দ, ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ হয়। প্রবল ইন্দ্রিয়সুখে একটা সুখের মোহ আইসে। সেই সুখের অবস্থায় জীবের জ্ঞান পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়। উৎকট সুখে জীব ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ভোগের জন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই। সকল ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে সজ্ঞানে এই আনন্দ রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়! ধর্ম্ম জগৎ এই আনন্দের সংবাদ দেয়। গীতা জীবকে এই আনন্দ ধামে লইয়া যাইতেছেন।

নিত্য আনন্দে জীবের স্থিতি সম্ভব কি অসম্ভব, এস্থানে ইহার বিচার অনাবশ্যক। বেদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। তিনি নিত্য, তিনিই জ্ঞান, তিনিই আনন্দ। নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। শুদ্ধ আনন্দই যে নিত্য আর কিছুই নিত্য নহে, তাহা নহে; জ্ঞানও নিত্য। জ্ঞান ও আনন্দ চির সম্মিলিত। জীব এই নিত্য আনন্দ পাইলেই জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে।

কেহ বলেন—কর্ম্মেই আনন্দ, কেহ বলেন—যোগেই আনন্দ, কেহ বলেন—ভক্তিতেই আনন্দ, আর কেহ বলেন—জ্ঞানেই আনন্দ। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা বলেন—কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহারা পরে পরে আনন্দপ্রাপ্তির ক্রম বটে। গীতার মতে যাঁহারা কর্ম্মযোগী তাঁহারা আরুরুক্ষ। ইঁহাদের জন্য কর্ম্ম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তপ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান এইগুলি বৈদিক কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন লৌকিক কর্ম্মও আছে। যেমন আহার ভ্রমণাদি। কামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন—যিনি সুখদুঃখ, জয়-পরাজয় লাভ-অলাভ বিচার না করিয়া ভগবদ্‌আজ্ঞা বোধে কর্ত্তব্য করেন—যিনি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার প্রাণ সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহকালেই ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়। শ্রুতি বলেন—

"অথাহকাময়মানো যোহকামো নিষ্কামো
ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীহৈব সমবলীয়ন্তে"।

যিনি কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করেন যাঁহার কোন কর্ম্ম নিজের জন্য কৃত না হয়, সকল কর্ম্মই ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য কৃত হয়, শ্রুতি তাঁহার গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন—ইহার ঠিক উপরের অবস্থার নাম-যোগারূঢ় অবস্থা। এ অবস্থায়

একান্তে গমন করিয়া মনোনিবৃত্তি করিতে হইবে। শম অভ্যাস দ্বারা আত্মসংস্থ হইতে হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। এই সমস্ত সাধনাতে আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু পূর্ণজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণপ্রেম সম্ভবে না। মহাদেব, বশিষ্ঠ, নারদাদি পূর্ণ জ্ঞানীই পূর্ণপ্রেমিক। প্রেমের আরম্ভ বিশ্বাসে, এবং সমাপ্তি জ্ঞানে। পরমেশ্বরই পরম প্রেমস্বরূপ, পরম জ্ঞানস্বরূপ। গীতা জ্ঞান লাভের ক্রম দেখাইতেছেন। বিশ্বাসীর প্রথম কার্য্য নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা, দ্বিতীয় কর্ম্ম আত্মসংস্থ যোগানন্দ, তৃতীয় কর্ম্ম ভজনানন্দ, এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞান। জ্ঞানেই স্বরূপে স্থিতি। নিষ্কাম কর্ম্ম বা উপাসনা, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাই গীতার পথ। বেদে যেমন কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড আছে গীতাও সেইরূপ কাণ্ডত্রয়-ভেদে 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা মাত্র।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"

যাহা লাভ করিলে সকলই লাভ হয় অন্য লাভ ইচ্ছা থাকে না—গীতা বলেন মনুষ্য এই অবস্থা লাভ করুক। ইহারই জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি। কিন্তু আরম্ভ করিতে হইবে, কর্ম্ম হইতে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

"সৃষ্টির প্রারম্ভে, ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন—এই কর্ম্ম দ্বারা তোমরা ক্রমোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। কর্ম্ম সঙ্কেতে আমরা কর্ম্মের সঙ্কেত ক্রম অনুসারে দেখাইব।

নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান মনুষ্যকে সীমাশূন্য সুখের অবস্থা প্রদান করে। "এই অবস্থা পাইব" এই আশায় বিশ্বাসীর চিত্ত প্রলুব্ধ হয়। এই নিত্য আনন্দধামে গমন করিলে দেহ শীতে উষ্ণে পীড়িত হয় না, প্রাণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত হয় না, মন সুখে দুঃখে, লাভালাভে, জয়পরাজয়ে, মানাপমানে, কিছুতেই চঞ্চল হয় না। এই অবস্থায় বুদ্ধি অজ্ঞানের হস্তে বিড়ম্বিত হয় না; বিচারোজ্জ্বলা, বুদ্ধি, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বুঝিতে পারে, কার্য্য ও অকার্য্য দেখিতে পায়; নশ্বর বিষয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সেই নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিতে ভালবাসে; সর্ব্বদা সর্ব্বদেশে সর্ব্ব বস্তু মধ্যে যেন কাহারও প্রকাশ দেখিতে পায়, সর্ব্ব ব্যাপারে যেন কাহারও খেলা দেখিতে পায়; জড়প্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতি, সর্ব্বত্রই দেখিতে পায়, কে

ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন ; এই অবস্থায় হৃদয় সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইতে থাকে। ক্রমে জগৎ আনন্দময় হইয়া যায়। এই সীমাশূন্য আনন্দ গীতার লক্ষ্য।

গীতা তিন ষট্কে বিভক্ত ; এই তিন ষট্কে আমরা আত্মসংস্থ যোগী, ভগবন্নামরূপ ভাবানুরাগী ভক্ত, এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর সাধনা ও প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্থিত প্রজ্ঞের প্রতিকৃতি, মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তের সহাস্যমূর্ত্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে পরম জ্ঞানীর শান্তমূর্ত্তি, গীতার লক্ষ্য সুস্পষ্ট করিতেছে।

যে সমস্ত শ্লোকে যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানীর অবস্থা প্রকাশিত, তাহা নিত্য পাঠ করা আবশ্যক। লক্ষ্য স্থির থাকিলেই কর্ম্মোদ্যম শিথিল হয় না। আমরা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাজ্ঞাপক কতকগুলি শ্লোক একত্র করিলাম। এগুলি কণ্ঠস্থ করিলেও বহু উপকার হয়।

যোগী দুই প্রকার—ব্যুত্থিত যোগী ও সমাধিস্থ যোগী। অহংকার জন্মিলেই সাধক ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি 'যোগী' অভিমান করিয়া থাক, তবে নিত্য বিচার করিয়া দেখিও গীতোক্ত যোগীর অবস্থা তোমার কতদূর লাভ হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

এইরূপ ব্যুত্থিত যোগী কিন্তু নিষ্কর্ম্মা নহেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

আবার বলিতেছেন—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

তাই বলিতেছিলাম—যখন শুনি এরূপ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকে; দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই; যে অবস্থায় রাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নাই, শুভ আসুক বা অশুভ আসুক কোন চঞ্চলতা নাই, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখস্বরূপ ঈশ্বরে রমণ করে—আর রাগ দ্বেষশূন্য আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ হইলেও কখন অশান্তি আইসে না; সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও ঈশ্বর হইতে মন কণবাকের জন্য সরিয়া আইসে না;—যখন শুনি "পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্, প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি, ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্"—সমস্ত কার্য্য করিয়াও ব্রহ্মে অবস্থিত থাকা যায়, আর যে অবস্থা লাভ করিলে গুরুদুঃখও বিচলিত করিতে পারে না—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তখন কা'র না ইচ্ছা হয় এই অবস্থা লাভ করি?

গীতায় আত্মসংস্থকে যোগী বলা হইয়াছে। এই যোগী, তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু আত্মসংস্থ অবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত দৃঢ় না হয় ততদিন চিত্ত স্থিরভাবে আত্মস্থ থাকে না।

চিত্ত আত্ম-রস আস্বাদন না করিলে কখনও স্থায়ী ভাবে আত্মসংস্থ হইতে পারে না। এজন্য যোগীকে ভক্ত হইতে হইবে।

যোগীনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যে যোগী অনুরাগে ঈশ্বর ভজনা করেন, সেই ভক্ত যোগী সর্বযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মধ্য ষট্‌ক। এই মধ্য ষট্‌কে আমরা ভক্তের চিত্র দেখি। এখানেও দেখি ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন কিরূপে ভক্ত হওয়া যায়, ভক্তির সাধনা কি এবং ভক্তের অবস্থা কি—অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞান সাধনা ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা ভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান সম্বন্ধে গীতা পরোক্ষজ্ঞান সাধনা ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ভক্তের সহাস্য মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য আমরা গীতা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

ভক্ত ভগবানের বড়ই প্রিয়। ভগবান্ বলিতেছেন—

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

যোগী হও বা ভক্ত হও উভয়কেই এক অবস্থা লাভ করিতে হইবে। আত্মসংস্থ যোগী পরিপক্কাবস্থাতে ভক্ত। এতদ্ব্যতীত গীতা জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহা গুণাতীতের অবস্থা।

গীতা বলিতেছেন:—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যোন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীগুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্যচ॥

গীতার শেষ লক্ষ্য এই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গীতা পরম জ্ঞান ও পরাভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির পরে পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞানে ব্রহ্মে অবস্থান, তৎপরে পরাভক্তি।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

এই পরাভক্তিদ্বারা তত্ত্বের সহিত ভগবানকে জানা যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানে জীব ব্রহ্মের একতা অনুভূত হয়, ইহাই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তিই গীতার লক্ষ্য। আবার বলি—অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস মোক্ষ-যোগ।

লক্ষ্য সঙ্কেতের উপসংহারে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়টী গুটাইয়া সম্মুখে ধরিব—গীতা কি এক আনন্দ-মন্দির দেখাইতেছেন। ঐ আনন্দ-মন্দিরের

চারি পার্শ্বে আনন্দ কুঞ্জ—কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দময় তরুলতা কি এক আনন্দের হিল্লোলে নাচিতেছে, আনন্দ-লতায় আনন্দ-কুসুম, প্রতি আনন্দ-কুসুমে আনন্দময় ভ্রমর সদানন্দে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে গুঞ্জন করিতেছে! এই আনন্দ-মন্দিরে উপস্থিত হইলে মানুষ রোগ শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়. রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হয়, শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভালাভ, জঠর-ভরণ, পরিবার-পোষণ, সমাজ-শাসন, রাজ্য-পালন, কিছুতেই জীবকে চঞ্চল করিতে পারে না, গীতার লক্ষ্য সেই আনন্দধাম। সেখানে দেহ নীরোগ, মন রাগ-দ্বেষ শূন্য, জীব অজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় সর্ব্বদা বিহার করেন—সেখানে মিলন-বিচ্ছেদের হর্ষ-বিষাদ নাই, সেখানে জনন-মরণের বিভীষিকা নাই, সেখানে আনন্দের ক্ষণিকত্ব নাই—সেখানে নিত্যানন্দ বিরাজমান, গীতার লক্ষ্য সেই স্থান। সেখানে আত্মা কি, জগদাড়ম্বর কেন, মানবের কর্ত্তব্য কি, এতদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, যে অবস্থায় কোনপ্রকার অজ্ঞান নাই, সেই অবস্থাই গীতার লক্ষ্য। ঋতুর পরিবর্ত্তন, চন্দ্র সূর্য্যের গমনাগমন, মহাভূতগণের পরস্পর আক্রমণ—যেখানে কোনপ্রকার চলন নাই, যেখানে প্রকৃতি আপন গুণে কর্ম্ম করিলেও আত্মার কোন বন্ধন হয় না, গীতা সর্ব্ব মানুষের জন্য সেই আনন্দ-মন্দির লক্ষ্য করিয়াছেন। তুমি পাপী হও, তাপী হও দুরাচার হও কুৎসিত-কর্ম্মা হও, তুমি ধার্ম্মিক হও, বা অধার্ম্মিক হও, গীতার লক্ষ্যে লক্ষ্য স্থাপন কর—গীতার কর্ম্ম অভ্যাস কর, তোমার সর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা হইবে, তোমার সর্ব্ব ভয় দূর হইবে—যদি দেহ মন জীর্ণ হইয়া থাকে, যদি শেষ সময়ও উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি গীতা তোমায় নিরাশ করেন না, বলিতেছেন—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" বলিতেছেন—"অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ" যদি সকল অপেক্ষাও অধিক পাপী তুমি হও—আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিব। বলেন—যখন সকলে তোমায় পরিত্যাগ করিবে, তখনও সে তোমার পরিত্যাগ করিবে না, যদি দেহত্যাগও করিতে হয়, তথাপি দেখিবে সেই সুন্দর ভগবান্ তোমার হস্ত ধরিয়া আপন আনন্দ ধাম, মুক্তি মণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে কি আর মৃত্যুতে দুঃখ থাকে?—সে মরণ ত সুখের, যে মরণে তোমার ভগবান্ তোমার পুরাতন দেহ ত্যাগ করাইয়া নূতন দেহ পরাইয়া দিবেন, তুমি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্রে নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। অজ্ঞান আর তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। কখনও

তোমার নিরানন্দ আসিবে না, কখনও তুমি অনিত্য বিভীষিকায় ব্যাকুল হইবে না। ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বাসবান্ হও ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবতী হও অগ্রে ভগবানের হও, দেখিবে—ভগবান্ চিরদিনই তোমার রহিয়াছেন।

গীতা বড়ই আশ্বাসদায়িনী! তুমি অজ্ঞানে দেখিতে পাওনা, ভগবান্ তোমায় কত স্নেহ করেন, ভগবানের স্নেহ অনুভব কর আপনিই ভক্ত হইয়া যাইবে। আরও লক্ষ্য কর—ভগবান অপেক্ষা ভক্ত কে আছে? কেহ অপরাধ করিলে, সেই অপরাধী তোমার চক্ষুঃশূল হয়, সে নিকটে আসিলে তুমি বিরক্ত হও, আর ভগবান্—তুমি তাঁহাকে কত অভক্তি কর, কত অবিশ্বাস কর, তাঁহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তোমার সন্দেহ, তথাপি তিনি একক্ষণকালও তোমায় ছাড়িয়া নাই, সর্ব্বদা তিনি তোমার সেবায় ব্যস্ত, তুমি ইহা অনুভব কর তাঁহার ভক্ত হইয়া যাইবে।

কোন্ কর্ম্মদ্বারা গীতোক্ত আনন্দের অবস্থা লাভ করা যায়, আমরা এক্ষণে তাহার এক অংশের আলোচনা করিব। কর্ম্ম সঙ্কেত আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, আধুনিক সময়ের সহিত প্রাচীন কালের কথঞ্চিৎ তারতম্য দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালে আত্মরক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য. আত্মরক্ষার জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা প্রথমেই করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগদ্-রক্ষা হইত। প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্ত ভিন্ন যথার্থ জগৎ রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ নহে। উপস্থিত সময়ে জগদ্-রক্ষাই প্রথম, আত্মরক্ষা একরূপ নাই, আত্মরক্ষার জন্য কর্ম্মে লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই, এই ক্রমবিপর্য্যয়ে বহুলোক জগতের জন্য কর্ম্ম করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অকালে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং অল্পকালেই তাঁহাদিগের প্রদত্ত শক্তি জগৎ হইতে অপসারিত হইতেছে। এই জন্য জগতের স্থায়ী উন্নতি হইতেছে না। জীব গীতার উপদেশ লাভ করিয়া আত্মরক্ষার সহিত জগদ্-রক্ষার কর্ম্ম করুক—নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করুক তাঁহার কর্ম্মে জগৎ অভ্যুদয় পথে ছুটিবে, জীব আপনিও কামনা শূন্য হইতেছে বলিয়া ক্রমে ক্রমে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

জগদ্ রক্ষাকারীও জীবন্মুক্ত্যভিলাষীর সামান্য বিবাদের কথাও এখানে উল্লেখ যোগ্য। কর্ম্ম-বীরগণ সাধকগণকে অলস বলেন, আবার সাধকগণ কর্ম্ম-বীরগণকে মূঢ় বলেন। এই উভয়প্রকার তিরস্কারই কতক অংশে সত্য। কর্ম্মবীর যদি ঈশ্বর-প্রীতি জন্য কর্ম্ম না করেন, যদি তিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম

করিতে না পারেন, তবে তিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিলেন না ইহাই তাঁহার মূর্খতা। আবার সাধক যদি ক্রম ধরিয়া সাধনা না করেন, প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা পরে যোগ ভক্তি জ্ঞান ইহা যদি তিনি না করেন, তবে তিনি সিদ্ধি লাভও করিতে পারেন না, পরন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়রোধ করিয়া মনে মনে যখন ধারণা ধ্যান করিতে যান তখন তাহাও সম্পন্ন হয় না, এজন্য ধর্ম্ম জীবনে তাঁহার মিথ্যাচার ঘটে।

আত্মরক্ষা ও জগদ্-রক্ষার জন্য গীতার মীমাংসা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত হইবে গীতা বলিতেছেন,—আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মের ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে লৌকিক কর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মের কথা যাহা বলা হইয়াছে, প্রথম অবস্থায় ঐ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কৃত হইলেই স্থূল স্থূল ভাবে জগদ্-রক্ষার কর্ম্ম হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত আবার "জীবে দয়া" প্রদর্শন জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম করেন তাহাতেই যথার্থ ভাবে জগদ্-রক্ষা হইয়া থাকে। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াও জগদ্-রক্ষা করিয়া থাকেন। জনকাদি জীবন্মুক্তঋষিগণ লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিতেছেন :—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

ভগবানের কোন কর্ত্তব্য নাই, তথাপি তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহা কেবললোক-শিক্ষার্থ। তিনি কর্ম্ম না করিলে তাঁহার প্রজা তাঁহার পথ অনুসরণ করিবে, তিনি তখন সঙ্করজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন। ইহাদিগদ্বারা জগতের ঘোরতর

অনিষ্ট হইবে এবং তিনি আপনিই আপন প্রজার বিনাশ কর্ত্তা হইবেন। এই জন্য তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

দেখা গেল আত্মরক্ষার আদিতেও কর্ম্ম—সে কেবল চিত্তশুদ্ধি জন্য। জীবন্মুক্তির পরেও কর্ম্ম—সে কেবল লোক-শিক্ষার্থ। ভগবানের অবতার গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করা আর জীবন্মুক্তের কর্ম্ম করা একই কথা। কাজেই আত্মরক্ষা কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত—তাঁহাদের সাধনাবস্থার মধ্যভাগে কর্ম্ম না থাকিলেও প্রবৃত্ত অবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থার পরে কর্ম্ম আছে। এই কর্ম্মদ্বারাই যথার্থরূপে জগৎ রক্ষা হয়। ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা যোগী ভক্ত বা জ্ঞানীকে স্বার্থপর বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল আপন মূর্খত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সমস্ত লোকের মতে জগৎ রক্ষার জন্য কর্ম্ম করাই আত্মার যথার্থ উন্নতি সূচনা করে, কারণ আত্মা জগতের অন্তর্গত বলিয়া জগতের উন্নতিতেই আত্মার উন্নতি, এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আত্মার উন্নতি মোক্ষপথে জগতের উন্নতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে। তত্ত্বজ্ঞ ইহা জানেন যে,যে কর্ম্মে জগতের প্রকৃত উন্নতি হয় সেই কর্ম্মেই যদি কর্ম্মী,জরা আধি ব্যাধি এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা না পায় এবং অন্যকে জরা আধি ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তবে ক্ষণিক সুখের আয়োজনকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না। তত্ত্বজ্ঞ জানেন—আত্মা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, আত্মার মধ্যেই জগৎ। এই বিশ্ব দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীতুল্য, নিদ্রাকালে আপন মনের মধ্যেই নানা প্রকার স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অনুভূত হইলেও যেমন মনে হয় ঐ সমস্ত বস্তু বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছে—সেইরূপ জগৎ আত্মার মধ্যে অবস্থিতি করিলেও মনে হয় ইহা বাহিরে রহিয়াছে। আত্মার মধ্যেই এই জগৎ এজন্য প্রকৃত আত্মরক্ষা যিনি করেন তিনি যথার্থভাবে জগদ্-রক্ষাও করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষার জন্য আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তি-যোগ ও জ্ঞান-যোগ আবশ্যক। জগদ্-রক্ষার জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম আবশ্যক। যেরূপ মনুষ্য হউক না কেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ক্রম অনুসারে এই চারিটি জীবের প্রয়োজন।

সাধারণ লোকে আত্মরক্ষা দ্বারা কিরূপে দেহ ও জগদ্-রক্ষা হয় তাহা ধারণা করিতে পারে না, শুধু দেহ ও জগদ্ রক্ষার জন্য অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ-রক্ষণই ইহাদের ব্রত। অর্থ-রক্ষা অর্থবৃদ্ধি তদ্দ্বারা ক্ষণিক সুখ, যশ মান ইত্যাদি ক্রয়, উত্তরোত্তর আপন অধিকার বৃদ্ধি, জগদ্ অধিকার জন্য শারীরিক

সামর্থ্য বৃদ্ধি, মানসিক কৌশল প্রকাশ, কোথাও বা যথাসাধ্য ক্ষণিক পরোপকার দ্বারা চিত্তবিনোদন এই সমস্তই ইঁহাদের মতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

কিন্তু অর্থ ও কামের মূলে যদি ধর্ম্ম না থাকে তবে তাহাতে অনর্থ ই উৎপন্ন হয়। জগদ্‌-রক্ষার জন্য অর্থেরও যেমন প্রয়োজন যুদ্ধাদিরও সেইরূপ প্রয়োজন যুদ্ধাদিজন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিকৌশলে অস্ত্রের সংহার প্রয়োগও আবশ্যক। আবার অর্থাগম জন্য বাণিজ্য কৃষি পশুপালনাদিও আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষা ও জগদ্ রক্ষা উভয়েই জীবের প্রয়োজন। আমরা কর্ম্মসঙ্কেতে জগদ্‌-রক্ষার কর্ম্ম উল্লেখ করিব না এজন্য এস্থানে ত্রিবর্গ জন্য কর্ম্ম বলিয়া রাখিলাম।

কর্ম্ম ভিন্ন জগদ্‌-রক্ষা বা আত্মরক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ কর্ম্ম মনুষ্য করিবে? মানুষ যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ, তাহাই তাহার উন্নতির ভিত্তি। স্বভাবজ কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে পারিলেই মানবের প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু কোন একটি কর্ম্ম সকল মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতেই পারে না, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। স্বাভাবিক কর্ম্মকে ভিত্তি না করিয়া যদি সকল মনুষ্যের জন্য এক প্রকার কর্ম্মের বিধি করা যায়, তবে সমাজ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক শক্তিতে ভিত্তি না করিয়া যদি সকল মনুষ্যের জন্য এক রূপ ঈশ্বরের সাধনা ব্যবস্থা করা যায়, তবে ধর্ম্মও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে মনুষ্যদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের স্বভাবজ কর্ম্মের ও বিভাগ হইয়াছে। এই গুণ-কর্ম্ম-জনিত বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক।

উপস্থিত সময়ে কখন কখন শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নীচত্ব নির্ব্বাচিত হয়। শুভ্র-জাতি কৃষ্ণ-জাতি হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ইহা কতক গুলি লোকের মত। এই মত যে ভ্রান্ত ইহাও অন্য কতকগুলি লোকে প্রমাণ করেন, প্রতিবাদকারিগণ বলেন যদি এই মত সত্য হইত, তবে কোন কৃষ্ণবর্ণ জাতি কোন শুক্লবর্ণ জাতিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইতিহাস কিন্তু এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর্য্য জাতির রামকৃষ্ণাদি অবতার কৃষ্ণবর্ণ, অর্জ্জুনাদি রাজা কৃষ্ণবর্ণ, স্বয়ং ব্যাসদেব অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন!

যাঁহারা জাতি ও বর্ণভেদ ঈশ্বর-কৃত বিবেচনা করেন না "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইহার যাঁহারা কদর্থ করেন, তাঁহাদের উচিত "স্বভাবজ কর্ম্ম" নিশ্চয় করা। কোন মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম অধ্যয়ন

অধ্যাপনাদি, কোন মনুষ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম যুদ্ধাদি কাহারও স্বভাবজ কর্ম্ম অর্থোপার্জ্জনাদি কাহারও স্বাভাবিক কর্ম্ম সেবা। মানবের যে যে কর্ম্ম স্বাভাবিক সেই সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে। কোন প্রকার নিষ্কাম কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে পারে না। সমস্ত বিহিত কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে কৃত হইতে পারে। স্বভাবজ বিহিত কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে, ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ।

গীতা বলিতেছেন,—স্বভাবজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ কখন অন্য স্বভাবের নির্দ্দোষ কর্ম্ম করিবে না। আপন স্বাভাবিক কর্ম্মকেই নিষ্কাম ভাবে করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই প্রকৃত উন্নতি। অন্য প্রকৃতির উৎকৃষ্ট কর্ম্ম দেখিয়া অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়াই পরধর্ম্ম গ্রহণ। পর-ধর্ম্ম গ্রহণে প্রকৃত উন্নতি হয় না, কারণ ভিতরে স্বভাবজ সংস্কার থাকিয়া যায়, ঐ সংস্কার প্রবল হইয়া উৎকৃষ্ট পরধর্ম্ম করিতে দেয় না। তখন "ইতো নষ্ট-স্ততো ভ্রষ্টঃ" হইতে হয়। প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে সত্য, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এক প্রকৃতিতেই উদয় হয় সত্য, তথাপি যে প্রকৃতিতে যে গুণের আধিক্য তাহাকে তদনুরূপ নামে অভিহিত করা যায়। সাধককে যোগ ভক্তি জ্ঞান এক সময়েই যে অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে, অথচ সর্ব্বদা অনুষ্ঠানের জন্য একটিকে দৃঢ় করিয়া যে ধরিতে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত পরি-বর্ত্তন তাহার অন্যতম কারণ।

চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রাগ দ্বেষ নিবারণ জন্য কর্ম্মদ্বারা এককালে আত্মার উন্নতি ও জগতের রক্ষা উভয় সাধিত হয়।

চিত্ত শুদ্ধির পরে ভক্তি ও জ্ঞানের অভ্যাস, এই সময়ে একান্ত আবশ্যক। এই কালে কামনা ত্যাগ হইতে থাকে বলিয়া কর্ম্মও ত্যাগ হইতে থাকে। আবার সিদ্ধাবস্থায় লোক-রক্ষার্থ কর্ম্ম করিতে হয়। এই অবস্থার কর্ম্মে কোন বন্ধন থাকে না। ভগবান্, এবং জীবন্মুক্ত জনকাদি রাজা কর্ম্ম করেন কিন্তু সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়-রূপ আসক্তি সে সমস্ত কর্ম্মে থাকে না।

বলা হইতেছে উপাসনা ও যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই সাধনা দ্বারাই পূর্ণ-শক্তির বিকাশ হয়। আপন সীমাশূন্য শক্তির পূর্ণানুভবই জীবন্মুক্তি। জগৎকে প্রকৃত পক্ষে উন্নত করিতে জীবন্মুক্তই সমর্থ।

আত্মরক্ষার জন্য কর্ম্ম করিলে অনেকদিন জগতের উদ্ধার জন্য কর্ম্ম বাদ দিতে হয়, এ কথা সত্য, যতদিন উপাসনার ভূমিকায় মানুষ থাকে ততদিন

কর্ম্ম থাকে, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞান-ভূমিকায় আসিলে কোন কর্ম্ম থাকিতে পারে না এই সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়। এই সময়ে যিনি জগৎকে ভুলিয়া থাকিতে হয় বলিয়া দুঃখিত হয়েন,জগতের দুঃখে বড়ই কাতর হয়েন,তিনি না হয় জগতের জন্য চিরদিনই কর্ম্ম করুন, আর চিরদিনই জনন মরণ লাভ করুন। কিন্তু যাঁহারা জনন মরণ-রূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাদের জন্য এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে—যে, জগৎস্রষ্টা স্বদেশ-সংস্কারক অপেক্ষা জগৎকে অধিক ভালবাসেন। সংস্কারক উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ রক্ষা না হয় ভগবানই করিলেন, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে। "যাঁহার এই জগৎ তিনিই ইহার জন্য পথ দেখিবেন" এই বিশ্বাস করিয়া স্বদেশ-হিতৈষিগণ যদি আত্মরক্ষার কার্য্যটি সারিয়া এবং সেই কার্য্য করিতে করিতে জগদ্-রক্ষা সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েন, তবে আর তাঁহাদিগকে এই ঘোর জগৎ-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত দীনের মত এই সংসার হইতে বিদায় লইতে হয় না।

এক্ষণে গীতার কর্ম্ম সঙ্কেতের সার কথা আলোচিত হইবে।

অষ্টম কথা।

——§*§——

গীতার কর্ম্ম সঙ্কেত।

কর্ম্ম সঙ্কেতের এক অংশ আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কর্ম্ম সঙ্কেতের সমস্তই প্রায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে জীবন্মুক্তি ও সাধনার কথা বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

কর্ম্ম সঙ্কেতের সার কথা ব্রাহ্মী-স্থিতি। পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নাম ব্রাহ্মী-স্থিতি। ইহাই জীবন্মুক্তি। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্ম হওয়া যায়। পরমানন্দে স্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির অন্য পথ নাই।

মৃত্যু জরা ব্যাধি অতিক্রম করিতে হইলে ব্রাহ্মী-স্থিতি আবশ্যক, ব্রাহ্মী-স্থিতি ভিন্ন পূর্ণ শান্তি অসম্ভব, পূর্ণভাবে দুঃখনিবৃত্তিও সুদূরপরাহত।

প্রশ্ন হইতে পারে—জরা মরণ কি অতিক্রম করা যায়? গীতাই এই প্রশ্নের উত্তর করিবেন—গীতা বলেন—

"জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।" ৭।২৯

জরা মরণ অতিক্রম জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সাধনা করেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—মনুষ্য জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে। তজ্জন্য সাধনা চাই। গীতা আবার বলিতেছেন—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এই পরমানন্দে স্থিতিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি।

অনেকের ধারণা—জীব কখন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, এই ধারণা ভ্রান্তিমাত্র। গীতা বলিতেছেন—

"প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥" ৬।২৭

রজোগুণ-শূন্য প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতি-বাক্যের সহিত গীতার ঐকমত্য আছে। গীতা বলিতেছেন—

"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।" ৫।১৯

ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ও নির্দ্দোষ, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাবেই স্থিতিলাভ করেন। আবার বলিতেছেন—

"স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।"

স্থির-বুদ্ধি মোহহীন ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করেন।

আরও কত আছে—

"লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।" ৫।২৫

ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

কেহ বলেন ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ কি প্রার্থনীয়? নির্ব্বাণে ত কিছুই থাকে না। এইরূপ উক্তি যে ভ্রান্তি মাত্র, তাহা গীতাই প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রহ্ম হইয়া গেলেই জীবন্মুক্ত ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" ১৪।২

এই জ্ঞানলাভ করিলেই আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয়, তখন তাঁহারা আর সৃষ্টি কালেও উৎপন্ন হয়েন না, প্রলয় কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না।

ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—ইহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ব্রহ্ম হইয়া গেলে মানুষ যে জড়ের মত অবস্থান করে, যাহাদের মত এই, তাহাদিগকে গীতা বলিতেছেন—

"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" ৬।২৮
"স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।" ৫।২১

ব্রহ্ম সংস্পর্শ মাত্র যে সুখ, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ। যোগ দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত হইতে পারিলেই অক্ষয় সুখ লাভ হয়। ব্রহ্মই অক্ষয় সুখস্বরূপ।

ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিলে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, আর কখন তাহাকে পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। কারণ যিনি ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত, যিনি পরমানন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম কোথায় ?

আজ কাল অনেকেই পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন না। আবার কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মের বিকৃত অর্থও করেন! গীতা ইহাদিগকে নিরাস করিতেছেন— গীতা বলিতেছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমুদায় জানি, কিন্তু তুমি জান না। শত বিকৃত অর্থ করিলেও পুনর্জ্জন্ম নাই, একথা হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না। "অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ" আপনার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ—অবতার লীলাকারী মায়া মনুষ্য—স্পষ্ট ভাবেই জন্ম জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন। আরও বহুস্থানে পুনর্জ্জন্মের কথা উক্ত হইয়াছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

ব্রহ্ম লোক হইতে সকল লোক পুনরায় আবর্ত্তনশীল, কিন্তু আমাকে পাইলে লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুনর্জ্জন্মের অন্য অর্থ হইতে পারে না। একবার মনুষ্য হইলে আর যে মানুষ নিম্নযোনিতে পতিত হয় না, এ কথারও কোন যুক্তি নাই।

গীতা বলিতেছেনঃ—

"ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু।" ১৬।১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৬।২০

আমি (আমার হিংসাকারী ক্রূর নরাধম অশুভ সেই সকল ব্যক্তিকে) সংসারে আসুরী যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ভগবান্ শঙ্কর ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন "আসুরীষেব ক্রূরকর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামি"।

শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন "আসুরীষেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু".

শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন "অথ কপূয়চরণাঃ অভ্যাসেহ কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি" কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ অভ্যাসেহ-শীঘ্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যেরন্ ইতি শ্রুতেরর্থঃ।

"ততো যান্ত্যধমাং গতিং" গীতার এই উক্তির ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্কর বলিতেছেন "অধমাং নিকৃষ্টতমাম্" শ্রীমান্ স্বামী বলিতেছেন "অধমাং কৃমি-কীটাদিগতিম্"। অন্য অন্য শাস্ত্রও জীবের নানাযোনিভ্রমণের কথা বলিতেছেন, তথাপি যাঁহারা বলেন—পুনর্জ্জন্ম নাই, মনুষ্য হইলে আর সিংহ ব্যাঘ্র কৃমি কীটাদি হইতে হইবে না, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা কিরূপে করি?

মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"ধাম্নো ধামসহস্রাণি মরণান্তানি গচ্ছতি।
তির্য্যগ্‌যোনি মনুষ্যত্বে দেবলোকে তথৈবচ।"

শান্তিপর্ব্ব ৩০৫।২

জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্তদ্বারাই জগতের অজ্ঞান নাশ হয়। রোগী ঔষধ সেবনে চীৎকার করে বলিয়া যদি ঔষধ পরিত্যাগ করা যায়, তবে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞানীর জ্বালা চিরদিনই থাকিবে। একটু প্রাণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত চাপিয়া রাখা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে জগতের অনিষ্টই হয়। জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানীর উক্তি নিরসন হইল। এক্ষণে কিরূপে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

সাধনার কথা বলিবার পূর্ব্বে জীবন্মুক্তি লাভ করণোপযোগী শক্তি জীবের আছে কি না ইহার আলোচনা আবশ্যক।

ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি দিয়াছেন—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির আধার প্রাণ, ইচ্ছাশক্তির আধার মন এবং জ্ঞান শক্তির আধার বুদ্ধি। প্রাণ শরীরকে রক্ষা করে, মন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিষয় ত্যাগ করিয়া ভগবদ্-রসে পূর্ণ হয় এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করে। প্রাণায়ামাদি যোগ, ভক্তি যোগ এবং সাংখ্য-জ্ঞান সাহায্যে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইতে পারে। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের

সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে একটির সাধনাতে তিনটিই আইসে, যদি সাধক কর্ম্ম মধ্যে আট্‌কাইয়া না যান। আর এই তিন শক্তি দ্বারা যে জীবন্মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা এই তিনটি পথ প্রথমে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যে সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা যায়, তাহাও বলিতেছেন। আমরা সাধনার কথা পরে বলিব, এক্ষণে যাহা করিতে হইবে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

যে সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মই করুন বা কর্ম্ম শূন্যই থাকুন সর্ব্বদাই আনন্দে তিনি পূর্ণ। শাস্ত্রে দেখা যায়, বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং রাম কৃষ্ণাদি অবতার যখন একান্তে থাকেন—যখন অন্য কোন কর্ম্ম না করেন, তখন ধ্যানতৎপর হইয়া সমাধি বিশ্রাম করেন। আবার যখন কিছু কর্ম্ম আইসে তখন সমাধি হইতে বিরাম লাভ করিয়া উপদেশাদি করেন। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি :—

সৌমিত্রিরেকদা রামমেকান্তে ধ্যানতৎপরম্।
সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্ বিনয়ান্বিতঃ॥
অব্রবীদ্দেব ইত্যাদি।

জীবন্মুক্তি হইয়া গেলে সমাধি-সহকৃত ধ্যানানন্দ সর্ব্বদা আয়ত্ত হয়।

জীবন্মুক্তির নিকটে যাঁহারা গিয়াছেন, যাঁহারা ধ্যানানন্দ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ভোগ করিলেও সর্ব্বদা ঐ অবস্থায় থাকিতে পারেন না, তাঁহারা যখন ঐ অবস্থায় না থাকিতে পারেন, তখন সাংখ্য-যোগে অবস্থান করিবেন। সাংখ্য-যোগ অর্থ, বিচার যোগ। বুদ্ধিই বিচার করে। বুদ্ধিই জীবের শক্তি সমূহের মধ্যে প্রধান। বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয়—এই সংসারাড়ম্বর মনোবিলাস মাত্র—ইহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। আত্মা কিন্তু এই সমস্ত দৃশ্যমান মনোবিলাস হইতে ভিন্ন। এই ভূমিকায় সাধক "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাঽনঘ"। প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা অনুভব করেন। সাংখ্যের সদৃশ জ্ঞান আর নাই, যোগের সদৃশ বলও নাই। সাংখ্য ও যোগ সিদ্ধাবস্থাতে একই ফল প্রদান করে বলিয়া উভয়কেই এক বলা হইয়াছে। যোগ অপেক্ষা শাস্ত্রে সাংখ্য জ্ঞানের অধিক প্রশংসা দেখা যায়। মহাভারত শান্তি পর্ব্বে ৩০২ অধ্যায়ে দেখা যায়—"বিজ্ঞতম সাংখ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাংখ্য মতকে অক্ষয়, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম

ইত্যাদি নাম দিয়াছেন, উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরমর্ষিরা শাস্ত্রমধ্যে সাংখ্য মতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। বেদ, যোগ-শাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই সাংখ্য শাস্ত্র হইতে গৃহীত। সাংখ্য মতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য-সমুদায় সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। যাঁহারা সাংখ্যমত গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে যত্নবান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যগ্‌যোনি-গমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাস জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ণব তুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাংখ্য মত সম্যগ্‌রূপে অবগত হয়েন, তিনিই "নারায়ণ-স্বরূপ"। সাংখ্য মতের প্রধান উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে—দেহ, সংসার, জগৎ প্রভৃতি কোন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে না ইহারা কেহই আত্মা নহে, ইহারা মিথ্যা, এইরূপ ব্যবহার-পরায়ণ থাকিবে এবং আমিই আত্মা, আমি দেহ নহি, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি মনো-বিলাসের দ্রষ্টা, সর্ব্বদা ইহা আলোচনা করিবে।

এই ভূমিকার স্থিতিলাভে অসমর্থ হইলে বুদ্ধি হইতে মনে নামিতে হইবে। ভক্তিযোগ মনেরই কার্য্য। মানসপূজা ভক্তিযোগের সার বস্তু। ভক্তিযোগে মন রসে পূর্ণ হইলেই জ্ঞানযোগে যাইতে পারা যায়, তৎপরেই আবার ধ্যান-যোগে উঠিতে পারা যায়।

যাঁহারা ভক্তিযোগেও না থাকিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মনের সাধনা হইতে প্রাণের সাধনায় আসিতে হইবে। এই প্রাণের সাধনায় প্রধান কার্য্য প্রাণায়ামাদি। প্রাণায়ামাদি যাঁহারা অস্বাভাবিক বলেন, তাঁহাদিগকে গীতার উক্তিই স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—

> অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
> প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ॥
> অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ৪।২৯

আবার বলিতেছেন—

> স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
> প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ৫।২৭

অন্যত্র ভগবান্ বলিতেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥

প্রাণ ও অপান বায়ুকে সাম্যাবস্থায় আনিলে দেহের মধ্যে অগ্নি উপলব্ধি হয়। ইহাতেই জীবন ধারণ হয়।

বিনা অগ্নিতে জীবন ধারণ হয় না। আহার না করিয়াও যাহারা দেহে অগ্নি রাখিতে পারেন, তাঁহাদের আহারও আবশ্যক হয় না। সর্পাদি জীব শীতকালে ভূগর্ভে বাস করে, ভূগর্ভ অত্যন্ত উষ্ণ—সেইজন্য তাহারা ৫।৬ মাস কোন কিছু আহার না করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে। যাঁহারা যোগাদি সাধনা করিতেও পারেন না, তাহারা নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে আত্মসংস্থ যোগের উপযুক্ত হইবেন। উপাসনা নিষ্কাম কর্ম্মের নিম্ন অবস্থা। এই সাধনার ক্রম আমরা গীতা হইতে দেখাইয়াছি।

এই কথার উপসংহারে আমরা বলি—প্রাণ শরীর রক্ষা করে, মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া মনোরাজ্য রচনা করে এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা সৎ অসৎ ভেদ জানাইয়া দেয়। প্রাণ-স্পন্দন রহিত হইলে মনের বিষয়চিন্তাও শেষ হইল। মন আত্মসংস্থযোগে স্থির হইলে অন্য কোন চিন্তাই থাকে না। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হয় না বলিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে হয়। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্রসে সিক্ত হইলেই বুদ্ধি আত্মস্বরূপ জানাইয়া দেয়। এই অবস্থায় কোন কামনা থাকে না। মন সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য হইলেই জীব আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। ই অবস্থাকে জাগ্রৎ বলা যায় না, নিদ্রাও বলা যায় না, অথচ ইহা সর্ব্বপ্রকার জাড্যবর্জ্জিত অবস্থা—ইহাই স্বরূপাবস্থা। দৃঢ়রূপে সর্ব্বকামনাবর্জ্জিত অবস্থায় থাকাই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই স্থিতি নিত্য, ইহা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। স্থিতি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দেই হয়। ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করিয়াও ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া থাকা যায়।

জীবন্মুক্তি জন্য প্রধান সাধনা—

"সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি-গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫ অধ্যায়।

এই সাধনার অঙ্গীভূত কার্য্যগুলি এই—

(১) নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মশূন্য অবস্থালাভ, একান্তে গমন, সঙ্কল্প-প্রভব কামনা ত্যাগ। যতদিন একান্ত গমনে অধিকারী না হইতেছ ততদিন নিষ্কাম ক্রিয়া যোগ অভ্যাস কর। "তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়ম, প্রণব জপ অধ্যয়ন শাস্ত্র পাঠ ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ এই সমস্ত কর্ম্ম।

(২) আত্মাতে মনোযোগ করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয় নিয়মিত করা। কূটস্থ পানে চাহিয়া চাহিয়া বাহিরের বস্তু দর্শন ত্যাগ কর প্রণব শুনিতে শুনিতে বাহিরের শব্দ হইতে কর্ণকে পৃথক্ রাখ ইহা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ॥

(৩) বুদ্ধি দ্বারা আত্মার স্বরূপানুভব, মনকে আত্মসংস্থ করা সমস্তই প্রকৃত। আত্মা প্রকৃতির দ্রষ্টা। আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। আমি সেই আত্মা। প্রকৃতি নহি।

মোক্ষের জন্য চারি আশ্রম দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রম প্রায় সকলকেই অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন সাধক ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার জন্য যেমন অন্য আশ্রম আবশ্যক হয় না সেইরূপ কোন সুকৃতিশালী সাধক যদি আত্ম-সংস্থ সমাধিতে স্থির হইয়া যান, তখন তাঁহার অন্য সাধনা আবশ্যক হয় না। ঐ সমাধি হইতেই একেবারে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মসংস্থ যোগে স্থিতি লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না, এই জন্য দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইবার জন্যই ভক্তি যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারাই সমাধিসহকৃতধ্যানযোগে স্বস্বরূপে অবস্থান! "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ইহাই জীবন্মুক্তি।

আমরা জীবন্মুক্তি জন্য কর্ম্মগুলি মোটামুটি বুঝিলাম। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমগুলি আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস সিদ্ধির প্রাণ, সেইরূপ অভ্যাসও জীবন্মুক্তির জন্য নিতান্ত আবশ্যক। আমরা সকল প্রকার কর্ম্ম এস্থানে উল্লেখ করিব—

(১) যতদিন না জীব ও ব্রহ্মের একতাবোধরূপ জ্ঞানে জীব শান্তি লাভ করে, ততদিন ঈশ্বরে মন রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিতে হইবে। যোগ,

ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য বিষয়সঙ্কল্পত্যাগ, আত্মরসাস্বাদন ও পরমানন্দে স্থিতি। ইহাই গীতার সাধারণ কর্ম্ম।

কিন্তু এই কর্ম্মের জন্য আয়োজন অনেক। প্রথমেই ভিত্তি—বিষাদ-যোগই সর্ব্ব উপদেশের ভিত্তি। এ ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে পরমানন্দ-পথের পথিক হওয়া যায় না। জন্মমরণভীতি হইতে যিনি মুক্ত হইতে চাহেন না—সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যাঁহার লক্ষ্য নহে, তিনি কখন আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দের ভিখারী নহেন। দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি যাঁহার লক্ষ্য তাঁহার জীবন্মুক্তি হইবে না। মৃত্যুভীতিতে ব্যাকুলতাই বিষাদ যোগ।

২। বিষাদ-যোগ-ব্যাকুল চিত্তের প্রতিই সমস্ত আর্য্য-শাস্ত্রের উপদেশ। ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশ বিষাদ-যোগী রামচন্দ্রের প্রতি, গীতার উপদেশ বিষাদ-যোগী অর্জ্জুনের প্রতি, চণ্ডীর উপদেশ বিষাদ-যোগী সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের প্রতি এবং ভাগবতের উপদেশ বিষাদ-যোগী মুমূর্ষু পরীক্ষিতের প্রতি।

৩। একটু স্থির হইলেই দেখা যায়—সকল জীবই মৃত্যুভয়গ্রস্ত। ব্যাধি আধি সকলেরই আছে। কখন কোন্ ব্যাধি বা আধি মৃত্যুর অনুচর হইয়া আইসে, তাহার নিশ্চয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন্ দৈব কারণে কখন যে মৃত্যু আসিবে, কোন্ ভূতদ্বারা জীব কাল-কবলিত হইবে, কে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? শত সাবধান হইলেও মৃত্যু হইতে সাধারণ জীব রক্ষা পায় না। যদি পাইত, তবে রাজা বা রাজপুত্রের মৃত্যু হইত না।

৪। মৃত্যু ভয় লইয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বিষাদ জাগিবে। এই মধুরহাসিনী স্ত্রী, এই প্রিয় পুত্র, এই স্নেহাস্পদীভূতা কন্যা—ইহারাও মরিবে—কখন মরিবে তাহার নিশ্চয় নাই। কখন মৃত্যু হইবে ইহা স্থির নাই। কিরূপে তবে নিশ্চিন্ত থাকি? কোন্ সুখের জন্য এই অস্থায়ী সংসার আড়ম্বর? কেন এই বৃথা চেষ্টা? স্বজন বন্ধু বান্ধবের মরণ চিন্তাতেই অর্জ্জুনের বিষাদ-যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ মৃত্যুচিন্তায় বিষাদ যোগ দৃঢ় হয়।

৫। বিষাদ যোগে যখন চিত্ত ব্যাকুল হয়, যখন মনে হয় এত কর্ম্ম যে আমার করিতে হইবে ভাবিতেছি কিন্তু ইহার অবসর কি আমার আছে? যখন প্রাণ সর্ব্বদা কাতরতা অনুভব করে, মন যেন সর্ব্বত্রই মৃত্যুর ছায়া দেখে, তখন চিন্তা আইসে—এই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে কি উদ্ধার নাই? কেহ কি আমার নাই? জীব নিরাশ্রয় হইলেই আশ্রয় অনুসন্ধান করে।

৬। রক্ষার উপায় আছে। গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্ বিষাদ-যোগীকে যে যে

পথের মধ্যদিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাই রক্ষার পথ। আত্মরক্ষার উপায় জানিয়া সংসার-কুরুক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সংসারের জন্য আত্মবলি দাও, এ কার্য্যে প্রশংসা আছে—কিন্তু এইরূপ আত্ম-বলিতে সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করা হইল না, ইহাতেও অজ্ঞান আছে। আত্মরক্ষা ও জগদ্রক্ষা উভয়ই আবশ্যক।

৭। রক্ষার উপায়গুলিও স্বাভাবিক হওয়া চাই। কর্ত্তব্যটি পূর্ণ কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। মনুষ্যের পূর্ণ কর্ত্তব্য কি, ইহা ধারণা করা কঠিন। যে মনুষ্য-দেহ ভিন্ন অন্যদেহে জীবন্মুক্তি-সুখ লাভ হয় না, সেই দেহ যাঁহাদের নিকট লাভ করিয়াছি—যাঁহারা এই দেহরক্ষা জন্য সহায়তা করিয়াছেন—সুবুদ্ধি জীব আপনা হইতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। বালক নিজ জীবনের জন্য বহু জনের নিকট ঋণী। পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজনাদি, সমাজ এবং মানবজাতি ইহাদের সকলের উপর কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। আদি কবি ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন :—

কৃতার্থাহ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে।

কে না স্বীকার করে—যে সমাজ, পরিবার, ও জাতির সাহায্য বিনা জীবন-ধারণ অসম্ভব। তথাপি কাহারও সামর্থ্য সত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি জগতের জন্য কোন কার্য্য না করে, তখন সে ব্যক্তি কৃতঘ্ন। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য্য-সাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহারা কৃতঘ্ন। কৃতঘ্ন মৃত হইলে ক্রব্যাদগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। রামায়ণ কৃতঘ্নসম্বন্ধে বড় কঠিন দণ্ড বিধান করিতেছেন। বলিতেছেন :—

"কৃতঘ্নঃ সর্ব্বভূতানাং বধ্যঃ"।

বলিতেছেন—

"গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

কৃতঘ্ন সর্ব্বপ্রাণীর বধ্য। সাধুগণ গোঘ্ন, সুরাপায়ী ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতিবিধান করেন নাই। জগতের নিকটে উপকৃত হইয়া যাহারা সামর্থ্যসত্ত্বেও জগতের কোন কার্য্য না

করে, তাহারা কৃতঘ্ন। কিন্তু জগতের জন্য কর্ম্ম যদি নিষ্কাম ভাবে কৃত না হয়, তবে তাহা অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। এই নিষ্কাম-কর্ম্মই আত্মজ্ঞান-লাভের প্রথম কর্ম্ম। এই জন্য বলা হয়—আত্মজ্ঞানের কার্য্যে আত্ম-রক্ষা ও জগদ্-রক্ষা উভয়ই সম্পাদিত হয়।

৮। আত্মার স্বরূপ জানাই আত্মজ্ঞান। সাংখ্য-জ্ঞানই আত্মজ্ঞান লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আত্মার স্বরূপ জানিলেই জনন-মরণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিত্য-আনন্দে স্থিতি লাভ হয়। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। "ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ, সর্ব্ব-কর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ" ভগবান্ শঙ্কর ইহার এই অর্থ করিয়াছেন।

৯। সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ দিতেছেন "আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মার কোন দুঃখ নাই, ভয় নাই, অজ্ঞান নাই—আত্মা আনন্দময়"। গীতা বলিতেছেন—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০

এই আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, এই আত্মা জলে সিদ্ধ হয় না, বায়ুতেও শুষ্ক হয় না। ইঁহার জননমরণাদি বা সংসার নাই. কোন অভাব নাই। আত্মার স্বরূপই এই। আমি দেহ নহি, জগৎও নহি, আমিই এই আত্মা, কাজেই আমার জন্ম মৃত্যু নাই, আধি ব্যাধি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কোন অভাব নাই, সংসার নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সাংখ্যজ্ঞানে ইহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন্মুক্তি হইয়াছে। জগৎসম্বন্ধে সাংখ্য-জ্ঞানী বলেন, জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, এই জগৎ আমি নহি, ইহার কোন বস্তুও আমি নহি, আমারও নহে, কারণ আমি স্বরূপে সর্ব্বত্র পূর্ণ। জগৎ যাহাই হউক—যাহাকে আমি সংসার বলি, যাহার ভাবনায় আমি পীড়িত হই, এ সংসার আমার মনোবিলাস মাত্র—ইহা আমার চিত্তস্পন্দনজন্য কল্পনা মাত্র—এই মনোবিলাস হইতেই ভুল 'আমি আমার' সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত "আমি"তে যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার নিকট দুই চারিটা ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইলেই বা কি, দুই দশটা ব্রহ্মাণ্ড নূতন হইলেই বা কি!

জীবের স্বরূপই এই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ আত্মা। মহাভারত বলিতেছেন—

"মূঢ়ব্যক্তিরা শাশ্বত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করেন—শান্তিপর্ব্ব ৩১৮ অধ্যায়—"তস্থ দ্বাবনু-পশ্যেতাং তমেকমিতি সাধবঃ"। উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যধি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ॥"

যিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয় হইয়াও আবার সর্ব্বভূতেই বাস করেন, এবং যিনি সর্ব্বলোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমিই সেই বাসুদেব স্বরূপ—এই প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাবনা করিবে।

আত্মা কিরূপে দেহ হইয়া যায়, সাংখ্য-জ্ঞানী তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেহ-হইতে মুক্ত হইবার কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেহের সুখকে আপনার সুখ এবং দেহের দুঃখকে আপনার দুঃখ বোধ করিতে থাকেন। এই সুখ ও দুঃখ অনুভূতি দ্বারাই আত্মা দেহে বদ্ধ হইতে থাকেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে আত্মা দেহই হইয়া যান। চক্ষুরাদি যাহাকে সত্য বলে, দেহাভিমানী আত্মা তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। দেখাগেল—সুখ-দুঃখ-অনুভূতিই আত্মার দেহত্ব-প্রাপ্তির কারণ। সাংখ্য-জ্ঞানী তাই সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে বলেন, শীত উষ্ণকে অবজ্ঞা করিতে বলেন, যতই আপন স্বরূপ চিন্তা হইতে থাকিবে, ততই সুখ দুঃখ যে আমার নহে, ইহা দেহের এবং দেহ আমি নহি, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—ইহা বোধ হইতে থাকিবে। দেহের সুখদুঃখের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা, দেহের নিদ্রা-আলস্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই, এই বোধ নিশ্চয়রূপে সিদ্ধ হইলেই সাংখ্য-জ্ঞানের কার্য্য হইয়া গেল। "আমি আত্মা" সাংখ্য-জ্ঞানী বিচার দ্বারা এবং সাধনাদ্বারা ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন।

'আমিই পরমাত্মা' এ বিষয়ে সাংখ্য-জ্ঞানীর উক্তি আমরা মহাভারত হইতে উল্লেখ করিতেছি:—

মমাস্তু ধিগবুদ্ধস্য যোঽহং মগ্নমিমং পুনঃ।
অনুবর্ত্তিতবান্মোহাদন্যমন্যং জনাজ্জনম্॥ ২৬

অয়মত্রভবেদ্বন্ধুরনেন সহ মে ক্ষমম্।
সাম্যমেকত্বমায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্॥ ২৭
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোঽহমনেন বৈ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা॥২৮
যোঽহমজ্ঞানসম্মোহাদজ্ঞয়া সম্প্রবৃত্তবান্।
সসঙ্গয়াঽহং নিঃসঙ্গঃ স্থিতঃ কালমিমং ত্বহম্॥

হায়! আমি অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক্। পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহাহইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহাহইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত, সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? (৺কালী সিংহের অনুবাদ ৩০৮ অধ্যায়)

প্রকৃতি হইতে জীবাত্মা পৃথক্—প্রকৃতিই গুণবিশিষ্টা, ঐ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও জীব যখন আপনাকে নির্গুণ অনুভব করিতে পারেন, তখনই তিনি বিশুদ্ধ। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। যখন মিশ্রিত হয়েন, তখন পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। এই জন্য দেহের সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, শীত, উষ্ণাদি অনুভব, এ সমস্ত আমার নহে, ইহারা দেহের বা প্রকৃতির, এই বোধ স্থায়ী হইলেই সাংখ্য-জ্ঞান-সাধনা পূর্ণ হইল।

১০। জীব ও ব্রহ্মের একতাই সাংখ্যজ্ঞান। সমস্ত গীতাতে 'তত্ত্বমসি' (তৎ ত্বম্ অসি) ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম আছেন, ইহা নিশ্চয় হওয়ার নাম পরোক্ষ-জ্ঞান। 'আমার আত্মাই ব্রহ্ম' এতদনুভূতির নাম অপরোক্ষ-জ্ঞান। অপরোক্ষানুভূতিব্যতীত সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই।

১১। বিনা কর্ম্মে অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভের সাধনা হয় না। জ্ঞানলাভ-জন্য যে সমস্ত কার্য্য আবশ্যক, তাহার প্রথম ভূমিকায় নিষ্কাম কর্ম্ম, দ্বিতীয়-ভূমিকায় আত্মসংস্থ-যোগ, তৃতীয় ভূমিকায় ভক্তিযোগ এবং চতুর্থ ভূমিকায় জ্ঞান-যোগ। এই সমস্ত সাধনার কথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২। পুস্তকে পড়িয়া যেমন যুদ্ধ করা যায় না, সেইরূপ পুস্তকে দেখিয়া যোগশিক্ষা করা যায় না। যতদিন না কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করা যায়, ততদিন জ্ঞান-লাভের সাধনা হয় না।

১৩। প্রথম ভূমিকা নিষ্কাম-কর্ম্ম। প্রথম অবস্থায় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতির জন্য করিতে হইবে। কর্ম্মের আদিতে মধ্যে ও অন্তে স্মরণ রাখিতে হইবে—কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিতেছি। নিষ্কাম কর্ম্মের সিদ্ধি তখন, যখন মন সর্ব্বদা আত্মসংস্থ, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি আপন অভ্যাসে ব্যবহারিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তবেই দেখা গেল—আত্মসংস্থযোগ ভিন্ন নিষ্কাম-কর্ম্ম ঠিক্ ঠিক্ সম্পন্ন হয় না।

গীতা বলিতেছেন—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি," "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" আরুরুক্ষুর প্রতি গীতা কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। আরুরুক্ষু লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, তাহাতেই লাভালাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ ইত্যাদি না দেখিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—তজ্জন্য করিতেছি—এ কর্ম্ম সম্পাদন কালে শীত উষ্ণাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিয়ম মত কর্ম্ম করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই আলস্য অনিচ্ছা দ্বারা কর্ম্মের নিয়ম ভঙ্গ করিতে পাইবে না ইহাই আরুরুক্ষুর যোগ। কিন্তু যোগারূঢ়ের জন্য কর্ম্ম নহে,—যোগারূঢ়ের জন্য শম। শম অর্থ মনের নিগ্রহ। বুদ্ধির সাহায্যে যতক্ষণ না মন আত্মাতে সমাধি-লাভ করে,ততক্ষণ যোগ হয় না। বুদ্ধিও যখন অবিচলিত হইয়া আত্মাতে নিশ্চল না হইবে, ততক্ষণ যোগ হইবে না—

"সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥"

১৪। কিন্তু মন সঙ্কল্পযুক্ত থাকিলে যোগ হয় না। যিনি কর্ম্মের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন—

"নহ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।"

যিনি অসংযমী, তাঁহার যোগ হয় না—

"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।"

১৫। ভোগেচ্ছার নাম কামনা। কামনাই আত্মসংস্থ হইতে দেয় না। বিষয়ভোগের কামনা থাকিতে কখন আত্মাস্বাদ হইতে পারে না। কামনাই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখে। এইজন্য গীতা বলিতেছেন—

"জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।"

১৬। কামনা জয় হইবে কিরূপে? কামনার দুর্গ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।"

এজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু মন যতক্ষণ বুদ্ধির বিচার না শুনিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়জয় হইবে না। বুদ্ধি একদিকে বস্তু-বিচার দ্বারা বস্তুর অনিত্যত্ব দেখাইতেছে, অন্যদিকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি নিত্যবস্তুর রূপ, গুণ ও স্বরূপ দেখাইতেছে। একদিকে বিষয়-বৈরাগ্য অন্য দিকে আত্মসংস্থ হইবার জন্য অভ্যাস। বৈরাগ্য ও অভ্যাস ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় হয় না। সর্ব্বকর্ম্মে কৃষ্ণ-স্মরণ—ইহা কামনা-জয়ের প্রথম অবস্থা।

১৭। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ," ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম্মরূপ তটস্থ-লক্ষণ তত্ত্বতঃ জানা উচিত। ইহাই ভক্তির সোপান। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। যোগও ভক্তিপূর্ব্বক করিতে হইবে। প্রাণ-সংযমন একটি প্রধান সাধনা। বহু প্রকারে প্রাণসংযম হয়। গীতা দ্বাদশ-প্রকার যোগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দ্রব্য-যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, আবার সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি আচরণ করিতে করিতে ক্রম-অনুসারে জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

"* * যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

১৮। যোগ না করিয়া যদি কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করে—আত্মসংস্থ হইতে না শিখিয়া যদি কেহ কর্ম্ম-ত্যাগ করে, সে নিতান্ত দুঃখ পায়—"সংন্যাসস্তু মহা-বাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ"। যোগীর কর্ম্ম কেবল আত্মশুদ্ধি জন্য। যিনি যোগ-গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহাকে গুরূপদেশে প্রাণ-সংযম করিতে হইবে। প্রাণ-সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—কামের এই তিন দুর্গ জয় হয়। যখন প্রাণ-সংযম অভ্যাস হইতেছে, মন প্রাণ-সংযমে স্থির হইতেছে, তখন যোগারূঢ়-অবস্থা। যোগারূঢ় হইলে মনকে শম অভ্যাস করাইতে হইবে। যোগারূঢ় হইলেই একান্তে আত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

১৯। যোগারূঢ় যোগী নির্জ্জন পবিত্রস্থানে সর্ব্বদা স্থির-সুখ আসনে কায়-গ্রীবাদি সমান রাখিয়া যুক্তাহার-বিহার হইয়া আত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিবেন। আত্মসংস্থের সাধনা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"সঙ্কল্প প্রভবান্" ইত্যাদি। যদি কোন সুকৃতিশালী পুরুষ মনকে একবার চিন্তা-শূন্য করিয়াই আপনার দ্রষ্টা-স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন—আমি দ্রষ্টা, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যাহা করে, তাহাতে

আমার সুখদুঃখাদি নাই— প্রকৃতির কর্ম্মের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই— এই দ্রষ্টা-স্বরূপে যদি কেহ স্থিতি লাভ করেন, তবে তাঁহার অন্য সাধনার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু প্রায় সাধকের ইহা হয় না—হয় না বলিয়াই দ্রষ্টা-স্বরূপে দৃঢ়তা জন্য ভক্তি আবশ্যক।

২০। তপস্বী, পরোক্ষজ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষা আত্মসংস্থ যোগী শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে যোগী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বর-ভজনা করেন, তাঁহাকেই যোগি-শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আত্মসংস্থভাবে দৃঢ়তা না হওয়া পর্য্যন্ত যোগীর মন বিষয়ে আসিতে পারে। দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইলেই মন আর বিষয়ে আইসে না। উভয়েই যোগী। যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, গীতা ভজনকারীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

২১। আত্মসংস্থতা ও ভক্তি এই দুইটি নিষ্কামকর্ম্মযোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এইগুলি আত্মজ্ঞান-লাভের নিকটবর্ত্তী উপায়। এতদ্ভিন্ন স্থূলভাবে যে সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে "তুমি প্রসন্ন হও" এই শ্রীকৃষ্ণার্পণ করিবার চেষ্টামাত্র করা হয়। এইটুকু নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সর্ব্বনিম্ন অবস্থা। গীতায় শ্রীভগবান্ কর্ম্ম—অর্থে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম, উভয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। "যৎ করোষি যদশ্নাসি" এই শ্লোক ইহার প্রমাণ। কিন্তু বৈদিক-কর্ম্মই গীতার মুখ্য কর্ম্ম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"। (ভূতানাং ভবধর্ম্মকাণাং স্থাবর-জঙ্গমানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবম্ উৎপত্তিম্ উদ্ভবং বৃদ্ধিঞ্চ করোতি যঃ বিসর্গঃ দেবোদ্দেশেন ত্যাগঃ শাস্ত্রবিহিতঃ যাগদানহোমাত্মকঃ। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ইতি ক্রমেণ স ইহ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দেনোক্তঃ।) শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞদান তপস্যাদ্বারা মনুষ্য দেবতাদিগকে ভাবনা করেন, তাঁহারাও বৃষ্টি অন্নাদি দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাদির উৎপত্তির ও বৃদ্ধির কারণ হয়েন। মনুষ্যের যে সমস্ত বিসর্জ্জনদ্বারা জীবের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই কর্ম্ম। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্"॥

এই সমস্ত কর্ম্ম এবং অন্যবিধ লৌকিক-কর্ম্মও যখন "তুমি সন্তুষ্ট হও" স্মরণ করিতে করিতে সম্পাদন করিতে পারা যাইবে, তখনই উচ্চ উচ্চ সাধনায় অধিকার জন্মিবে।

২২। যাঁহারা ক্রম ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে আত্মসংস্থ হইতে পারিতেছেন এবং ভক্তি-যোগে নিরন্তর ভগবদ্রস আস্বাদন দ্বারা আত্মসংস্থ-যোগে স্থিতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সকল কর্ম্মই স্বভাবতঃ নিষ্কাম হইয়া যাইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

এই সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ আত্মসংস্থ-যোগীর স্বাভাবিক। মুখের অভ্যাসে ইহা স্থায়ী হইতে পারে না—বিনা ভক্তিতে পরমপুরুষকে লাভ করা যায় না। গীতা বলিতেছেন—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" ৮।২২

কিন্তু তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে জানা এবং তাঁহার স্বরূপানুভূতি ও তৎস্বরূপে স্থিতি জ্ঞানযোগেই সম্ভব।

২৩। ভক্তি যোগে যে উপাসনা তাহারও প্রকার-ভেদ আছে। ভক্তি-সাধকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অভেদ ভাবনায়, কেহ বা পৃথগ্ ভাবনায়, অন্য কেহ বহু ভাবনায় তাঁহার উপাসনা করেন। "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্" ৯।১৫। এইরূপ ভক্তি-যোগে উপাসনা করিতে করিতে বিশ্বরূপের জ্ঞান জন্মিবে। যখন সর্ব্ব-জীবে নারায়ণ-বোধ হইবে, তখনই উপাসনা শেষ হইল। যতই ভগবদ্-বিভূতিতে দৃষ্টি পড়িবে, ততই উপাসনা পরিপক্ক হইবে। যোগি-ভক্তের মধ্যে কেহ বা বিশ্বরূপের উপাসক, কেহ বা অব্যক্তের উপাসক। অব্যক্তের উপাসক আপন সামর্থ্যে ঈশ্বর লাভ করেন, আর বিশ্বরূপের উপাসক ভগবৎ-সাহায্যে জ্ঞান লাভ করেন। ইঁহারাই ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। নিষ্কামকর্ম্মসাধকের সাধনার উপসংহারে বলিতেছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

ভগবান্ আত্মাই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয় বোধ হইলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করা যায়। ইহারই উপায় যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। "মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ" ইহাও ভগবানের উক্তি। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

২৪। যোগি-ভক্তের সাধন-ক্রম দেখাইয়া গীতা বলিতেছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

যদি আমাতে মন ও বুদ্ধি স্থির করিতে না পার—

"অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়"॥

বিশ্বরূপের ধ্যানাভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে—"মৎকর্ম্মপরমো ভব" অর্থাৎ আমাতে মন রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমারই কর্ম্ম কর। যদি ইহাও না পার, তবে—"কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ" অর্থাৎ আত্মসংস্থ-যোগ অভ্যাস কর। এই সমস্ত দ্বারা তোমার সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ হইবে। সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই কর্ম্ম-যোগের শেষ। এক স্থানে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ইহাই ভক্তিযোগের সিদ্ধাবস্থা। এই ভক্তিযোগের শেষফল জীব ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান। এই জন্যই গীতা অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী।

২৫। জীব ও ব্রহ্মের একতা জ্ঞানই জীবন্মুক্তি। গীতা বিংশতিপ্রকার জ্ঞান-সাধনা দেখাইয়াছেন। ত্রয়োদশ-অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও ১৮।৫১-৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক-মধ্যে যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে কর্ম্ম-সঙ্কেতের উপসংহার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি—

২৬। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আশ্রয় না করিলে কর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে না। বিনা কর্ম্মে শ্রুত-বিষয়ের স্থায়ী অনুভব হইবে না। তাঁহার অনুভব বিনা ভজন হইবে না। বিনা ভক্তিতে "তুমি আমার কে" ইহার অনুভব হইতে পারে না। গুণাতীত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভব হইতে পারে না। এই গুণাতীত-অবস্থা-লাভ জন্য রজঃ ও তমঃকে প্রতিহত করিতে হইবে এবং নিত্য-সত্বস্থ হইতে হইবে। যোগ ও ভক্তি-পথে নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা ইহা সাধিত হয়। ইহার পরে অব্যভিচারিভক্তিযোগে গুণাতীত হইতে হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানেই জীবন্মুক্তি। গুণাতীত অবস্থার কথা ১৪শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া মনন কর,—গুণাতীত অবস্থা পাইবার জন্য লোভ জন্মিবে। জরা মরণরূপ সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি এবং নিত্য ভগবৎ-সঙ্গে স্থিতি-জন্য পরমানন্দ-প্রাপ্তিতে কাহার লোভ নাই? ভগবান্ যখন যাহা করিবেন, তখনই তাঁহার কার্য্যে ভক্তকেও নিয়োগ করিবেন, ইহা কাহার ইচ্ছা নহে?

গুণাতীত অবস্থায় যখন কর্ম্মপ্রবাহ ছুটিবে, তখন এই রজোগুণের কার্য্যে কোন দ্বেষ নাই, যদি তমো গুণের কার্য্য হয় তাহাতে দ্বেষ নাই, সত্ত্বগুণ প্রকাশে যখন আনন্দ ভরা থাকে, তখনও আগ্রহ নাই। গুণাতীত ব্যক্তি কোন বিষয়ে দ্বেষ করেন না, কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এ সুখ কেন আসিল—আসিল ত গেল কেন, ইহা গুণাতীতের নাই। তিনি নিত্যতৃপ্ত,—যাহা আসে, যাহা না আসে, কিছুতেই তিনি বিচলিত নহেন। প্রকৃতির কার্য্যে তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত করিতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়-ব্যাপারে উন্মত্ত করিতে পারে না। ইনি সকল কার্য্যই করেন, কিন্তু যখনকার তখন; কর্ম্মের অবসানেই আবার নিত্যতৃপ্ত; ইহার মুখ-কমল ম্লান হয় না, ইনি সদানন্দ। এই অবস্থা পাইতে হইলে, আবার গুণাতীত হইতে হইলে, প্রথমে নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া চাই। নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থে যতক্ষণ না রজোগুণ ও তমোগুণ দূর হয়, ততক্ষণ যোগ মানসপূজাবৎ, সৎশাস্ত্র ইত্যাদির সাহায্য লওয়া চাই। যতক্ষণ না তমঃ ও রজঃ কাটিয়া যায়, ততক্ষণ সাধনা করাই সাধনা; নতুবা যে নিয়ম পালন, ইহা কোনই কাজের নহে। রজঃ ও তমঃ কাটিয়া গেলে, তখন সাধনাও মধুর হইল। এই নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা লাভ করিয়া গুণাতীত অবস্থালাভের জন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি চাই। অনুরাগে তাঁহার ভগবান্‌কে ভজন করা চাই। ইহার প্রথম অবস্থায় দেখা চাই, তুমি যেন ভগবানের সমক্ষে নীত হইয়াছ। সেখানে ভগবান্ আছেন, তাঁহার ভক্তগণ আছেন, তাঁহার জ্ঞানিগণ আছেন—বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস, শ্রীচৈতন্য, চূড়ালা, শিখিধ্বজ, লীলা, বিদূরথ, বিশ্বামিত্র, সনক, সনাতন সকলেই আছেন। তোমাকে সেখানে কথা কহিতে হইবে। তুমি কি কথা কহিবে? সেখানে কপটতা হয় না—নিজে যাহা তাহা গোপন করিয়া অন্য সাজা হয় না। কাজেই তোমার পাপের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাপের ক্ষমা চাহিবে। তখন ভগবান্ আপন ব্রত উদ্ধার জন্য তোমায় ক্ষমা করিবেন—'অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম' তুমি তাঁহার ক্ষমা পাইয়া পাপমুক্ত হইতে থাকিলে, তখন বুঝিলে—তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব; তিনিই তোমার গতি; তিনি ভিন্ন তোমার আর কিছুই প্রয়োজন নাই; তুমি তাঁহাকে না ডাকিয়া আর থাকিতে পার না। ইহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। এই ভক্তি দ্বারা বুঝিবে, তিনিই তোমাতে; তিনি সর্ব্ব জীবে আছেন; জগৎ যদি থাকে, তবে তিনিই; কাজেই সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ ভিন্ন তোমার আর কিছু হয় না। অতএব প্রথম কথাটি ভুলিও না—রজঃ ও তমঃকে পরাস্ত যতক্ষণ না করিতেছ, ততক্ষণ সাধনা করা চাই। এইটিই মূল সূত্র। এইটিতে

সিদ্ধিলাভ কর, তোমার কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ হইবে। তৎপরে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, তৎপরে 'মামেকং শরণং ব্রজ'-রূপ ভক্তি, পরে জ্ঞান তৎপরে মুক্তি।

আরও সহজে গীতার ক্রম উল্লেখ করা যাইতেছে—নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রথম কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, দ্বিতীয় অবস্থায় একান্তে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান। জ্ঞানেই মুক্তি।

গীতার লক্ষ্য ও কর্ম্ম বলা হইল। কিন্তু এত কথা বলিয়াও যেন তৃপ্তি নাই। কি জানি, কি এক অপূর্ব্ব ভাব গীতামধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা শত প্রকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেও যেন প্রকাশ করা যায় না। ভগবান্ সত্যই বলিয়াছেন—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। এত সূক্ষ্ম এই হৃদয়, এত বিশাল এই ভগবদ্-হৃদয়, যে কিছুতেই যেন ইহা ধরা দেয় না। ধরা দেয়—অথচ যেন ধরা হইল না বলিয়া বোধ হয়। ভগবানের কৃপা না হইলে ভগবান্‌কে ধরা যায় না।

গীতায় যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—সমস্ত সাধনার কথা থাকিলেও গীতাকে ভক্তি-গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর—ইহাই গীতার শেষ উপদেশ। ভগবান্, জীব ও চিত্ত—এই তিন লইয়া জগৎ। জীব যখন সর্ব্বদা আপন চিত্তের দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তখনই জীবন্মুক্ত হয়, তখনই আপন স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়। জীব কোন কোন অবস্থায় আপন চিত্তের দ্রষ্টা থাকিতে পারে, ইহা অনুভব করা যায়। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি রিপুর আক্রমণে, নিদ্রাক্ষুধাদির সম্মোহনে অভিভূত হইয়া দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। এজন্য সে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে করিতে ভগবানের সহিত এক হইতে পারিবে। প্রাণস্পন্দনরোধ যোগের শেষ কথা। যোগ নিতান্ত কঠিন। সকল লোকে ইহা পারে না। মহাভারতে এবং যোগবাশিষ্ঠে প্রাণস্পন্দনরোধ যে কত কঠিন তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ। 'আমি ব্রহ্ম' মুখে বলা সহজ, কিন্তু যখনই বলি—আমি সচ্চিদানন্দ, তখনই দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কতটুকু জ্ঞান আমার আছে, কতটুকু আনন্দ আমার সম্বল। পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ এই জন্য গীতাতে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যোগ ও জ্ঞান সাধনা কর। জীব আপন চিত্তের দ্রষ্টারূপে থাকিতে পারে না বলিয়া, সর্ব্বদা ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া উপাসনা করুক,—প্রার্থনা করুক,—তাঁহার সাহায্যে আত্মার বিচার করুক। তিনিই কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহার আশ্বাস-বাণী!

নবম কথা।

—:*:—

শ্রীগীতায় জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

শ্রীগীতায় উপাস্য-নির্ণয়।

(১) অক্ষর অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম।

(২) সগুণ ব্রহ্ম—ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী, প্রাজ্ঞ।

হিরণ্যগর্ভ, তৈজস।

বিরাট, বৈশ্বানর।

(৩) অবতার।

(৪) আত্মা।

ব্রহ্ম আপন স্বরূপের বিনাশ না করিয়াই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা।

শ্রীগীতায় উপাসনা-নির্ণয়।

(১) অক্ষর অব্যক্ত নির্গুণ উপাসনা—স্বরূপে স্থিতি।

(২) সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা—প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন বিচার।

(৩) অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা।

(ক) অবলম্বন ধরিয়া যোগীর উপাসনা।

(খ) অবলম্বন ধরিয়া ভক্তের উপাসনা।

(৪) মৎকর্ম্ম-পরম হইবার সাধনা—ভক্তি-উদ্দীপক কর্ম্মমাত্রে সাধনা।

(৫) মদ্‌যোগ আশ্রয়ে সাধনা—সর্ব্বকর্ম্মার্পণে প্রসন্নতা প্রার্থনা।

(১)

স্বস্বরূপে যিনি অবিজ্ঞাত, মায়ার উদয়ে যিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষরূপে গুণবান্ মত হয়েন,—হইয়া যিনি বহু হইব সঙ্কল্প করেন এবং মহদ্‌ব্রহ্মে গর্ভ নিক্ষেপ করিয়া যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ পুনঃ পুনঃ করিতে থাকেন; এবং জন্মাদি ব্যাপারকে সৃষ্টির প্রতি বস্তুতে মিশাইয়া রাখেন, আবার স্বরূপতঃ যিনি অজ হইয়াও সর্ব্বভূতের মহেশ্বর হইয়াও, জগতের কল্যাণ জন্য আত্মমায়ায় মায়া-মানুষরূপে

অবতীর্ণ হয়েন—হইয়া যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া দিয়া আবার আপনার আদ্যস্বরূপে যাইবার জন্য মায়ালীলা ভঙ্গ করেন এবং জীবে জীবে যিনি আত্মারূপে বিরাজ করেন, আমরা সেই নির্গুণ-সগুণ মায়া মানুষ আত্মাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

(২)

যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত গীতা আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই দেখিবেন, শ্রীগীতা একটি সনাতন সম্পূর্ণ ধর্ম্মের মন্দির। এই মন্দিরে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রয় লাভ করিয়াছে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম উঠিয়াছে, উঠিতেছে বা উঠিবে, যিনি গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখিয়াছেন, তিনি দেখিবেন, উহা সেই সম্পূর্ণ ধর্ম্মেরই অঙ্গ-বিশেষ।

সম্পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ না দেখা পর্য্যন্ত আংশিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ণ অংশের সহিত বিবাদ করেন না; কিন্তু পূর্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি পূর্ণের মুখ না দেখা পর্য্যন্ত আপনা আপনি বিবাদ করিতে পারে। আমরা গীতোক্ত এই সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখাইতে প্রয়াস পাইতেছি।

শুধু মানুষ কেন, এই বিশাল জগতের প্রতিসৃষ্ট বস্তুরই কোন না কোন ধর্ম্ম আছেই। জড়েরও ধর্ম্ম আছে, আবার চেতনেরও ধর্ম্ম আছে। কিন্তু আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই। তিনি সৃষ্টও নহেন, তিনি নিঃসঙ্গ। কোন অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ব্যাপারে চেতনের সহিত জড়ের মিলন হইলে, অনাত্মার ধর্ম্মটি আত্মায় অধ্যাস হয় মাত্র। এই অধ্যাস যখন পুনঃ পুনঃ হয়, তখন আত্মা আপন নিঃসঙ্গ ভাবে থাকিলেও লোকে তাঁহাকে প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত জড়িত হইতে দেখে। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাঁহারাই নিঃসঙ্গ আত্মাকে ধর্ম্মী পদার্থ বলেন।

বিনা স্পন্দনে কোন বস্তুর সৃষ্টি নাই। সীমাশূন্য অগাধ কোন বস্তু থাকিলেই তাহা হইতে স্পন্দনের মত কিছু উঠিবেই। মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ পরমশান্ত চিন্মণি হইতে যে স্বাভাবিক ঝলকের ন্যায় এক স্পন্দন উঠার মত মনে হয়; তাহা হইতেই এই মায়িক সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। আদি স্পন্দন ছন্দের মত হয়;—পরের স্পন্দনে ছন্দোভঙ্গ হয়। এই জন্য জগতে ছন্দোরহিত ও ছন্দঃসহিত এই দ্বিবিধ স্পন্দনই পরিলক্ষিত হয়।

ছন্দঃ সহিত স্পন্দন যাহা, তাহাই শুভ স্পন্দন; আর অসচ্ছন্দঃ স্পন্দন যাহা,

তাহাই অশুভ স্পন্দন। ছন্দোমত স্পন্দনে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা হয়; আর যে কর্ম্ম করিতে গেলে, ছন্দোভঙ্গ হয়, তাহাই অধর্ম্ম কর্ম্ম।

জগতে যত মনুষ্য আছে, সকলেরই সাধারণ কর্ম্ম আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। শুধু মনুষ্য নহে, জীবমাত্রেরই সাধারণ কর্ম্ম ইহা। এতদ্ভিন্ন মানুষের কতকগুলি অসাধারণ কর্ম্ম আছে। অসাধারণ কর্ম্ম দ্বারা সাধারণ কর্ম্মকে মানুষ বশে আনিতে পারে।

এই গ্রন্থে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মানুষের মধ্যে মূলশক্তিকেন্দ্র তিনটি; একটি প্রাণশক্তি, দ্বিতীয়টি মনঃশক্তি, তৃতীয়টি বুদ্ধিশক্তি। এই তিন শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় ছন্দোমত স্পন্দিত করাই সম্পূর্ণ ধর্ম্মের কর্ম্ম।

শ্রুতি বলেন,—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই সাধারণ কর্ম্মের ফল মৃত্যু। মৃত্যুই অসম্বদ্ধ প্রলাপরূপে মনের মধ্যে বাস করে। বেদে যে অসাধারণ কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অবিদ্যা হইলেও সেই অসাধারণ কর্ম্ম দ্বারা সাধারণ কর্ম্ম বা মৃত্যুকে জয় করা যায়। জ্ঞানটি অমরত্ব। কোন কর্ম্মই অমরত্ব দিতে পারে না। অসাধারণ কর্ম্ম দ্বারা বিদ্যালাভ হয়। বিদ্যা দ্বারা অমর হওয়া যায়।

যে বিদ্যাদ্বারা মানুষ প্রাণশক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারে, সেই বিদ্যার নাম প্রাণায়াম। ইহা যোগের প্রধান অঙ্গ।

যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ মনঃশক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারে, তাহাই মানস পূজা। ইহাই ভক্তিযোগের প্রধান অঙ্গ।

যে বিদ্যাদ্বারা মানুষ বুদ্ধি-শক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারে তাহাই বিচার-বিদ্যা। ইহাই জ্ঞানযোগের প্রধান অঙ্গ।

জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম লাভের উপায় এই যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মে স্থিতিই ভগবৎ প্রাপ্তি। স্থিতিটিই মিশ্রণ। তদ্ভিন্ন যাহা, তাহা মিলন।

প্রথমে হয় মিলন। মিলন হইতে হইতে চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের মত যখন অখণ্ড, খণ্ডকে আকর্ষণ করেন, তখন হয় মিশ্রণ।

জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম দেখাইতে হইলে, গীতোক্ত সাধ্য বস্তু দেখাইতে হইবে এবং গীতোক্ত সাধনাও দেখাইতে হইবে।

জগতে আধুনিক সময়ে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহাতে উপাস্য বস্তুটিকে

ঠিক একরূপে ধারণা করা হয় নাই, এবং উপাস্য বস্তুটি লাভ করিবার উপায়ও একরূপ নহে। শ্রীগীতা কিন্তু সাধ্য ও সাধনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,তাহার মধ্যেই আমরা জগতের সমস্ত ধর্ম্ম ও সমস্ত সাধনা দেখিতে পাই। ইহার বিশ্লেষণই এখানকার উদ্দেশ্য।

(৩)

ছন্দোরহিত স্পন্দনেই পাপের উৎপত্তি। যতদিন মানুষ পাপ ছাড়িতে না পারে, ততদিন মানুষ আপনার জীবনকে ঠিক মত চালাইতে পারে না। শরীর, বাক্য ও মনকে অথবা প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে যতদিন মানুষ ছন্দোমত স্পন্দিত না করিতে পারিল, ততদিন মানুষ নিজেও সুখ পায় না, অন্যকেও সুখী করিতে পারে না। কাজেই ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়; সমাজ ও জাতির জীবন দুঃখময় হয়।

পাপই তাপ। দুর্ব্বলতাই পাপের ভিত্তিভূমি। অবিচারই দুর্ব্বলতার জনক। বিচার দ্বারা দুর্ব্বলচিত্তকে সবল কর, তখন দেখিবে পাপ উৎপন্ন হইবার আর কোন পথ নাই। তখন মানবজীবন পবিত্র; তখন সমাজ ও জাতি ও পবিত্র।

মানুষের চিত্ত সবল হইবে কিরূপে? আজ পর্য্যন্ত জগতে যতগুলি উপায় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মানুষকে বিচারধর্ম্মী করাই চিত্ত সবল করিবার একমাত্র উপায়। যে বিচার মানুষকে প্রথমে ঈশ্বরের সহিত মিলন করায়, শেষে যাহা তাঁহার সহিত মিশ্রণ করাইয়া মানুষকে পরমানন্দে স্থিতি লাভ করায়, সেই বিচারই সুবিচার। সুবিচার ভিন্ন যথার্থ ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। আবার যথার্থ ধার্ম্মিক না হইতে পারিলেও পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। ইহা ভিন্ন আর কিছুতেই পবিত্র হওয়া যায় না। যে জীবনে পবিত্রতা নাই, সে জীবন পাপ-জীবন, সে জীবন অসচ্ছন্দ জীবন। সে জীবন প্রার্থনীয় নহে।

সকল মানুষের চিত্ত একরূপ নহে; কাজেই এক উপায়ে সকল চিত্তকে একভাবে আনা যাইবে না। চিত্তকে সুস্থ করাই প্রধান পুরুষার্থ। ইহার উপায়ও বহু। যে যাহা পারে, তাহা ধরিয়াই তাহাকে পুরুষার্থ করিতে হইবে। সকল উপায়েরই লক্ষ্য চিত্তকে বিষয়-মুখ ছাড়াইয়া ঈশ্বরমুখ করা। শরীর মন ও বাক্যকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারিলেই চিত্ত ঈশ্বরমুখ হইবে। যাহার চিত্ত যত ঈশ্বরমুখ তাহার চিত্ত তত সবল, সে তত নিষ্পাপ। যে পাপী, সে নিজের অপকার করে এবং জগতেরও অপকার করে।

একটি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাও সীমাশূন্য, ক্ষণস্পর্শ, পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর জলে স্পন্দন তুলিয়া থাকে। সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুদ্র পদ-সঞ্চালনে বিশাল সমুদ্র বক্ষে যে স্পন্দন উঠে, তাহার ক্রিয়া অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও সমস্ত সমুদ্রে তাহা সঞ্চরণ করে। সেইরূপ ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র শুভ অশুভ চিন্তাও এই বিশাল জগতে কার্য্য করে। শুভ চিন্তায় যে শুভ স্পন্দন উঠে, তাহাতে হিত আর অশুভ চিন্তায় যে অশুভ স্পন্দন উঠে, তাহাতে অহিত হইবেই।

ছন্দোমত স্পন্দনই যখন ধর্ম্ম আর জগতকে সুখী করিতে যখন ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য উপায় নাই এবং সাধ্য ও সাধনার যথার্থ ধারণা ভিন্ন যখন অন্য কোন উপায়ে স্থায়িভাবে ছন্দোমত স্পন্দনে থাকা যায় না, তখন জগতের পূর্ণ ধর্ম্মের প্রাপ্তি জন্য সাধ্য বিষয় ও সাধনার বিষয় গীতা যাহা দেখাইতেছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা বৃথা হইবে না।

সাধ্য বস্তুর কথা।

জগতের লোক সাধ্যবস্তুর একটি সাধারণ নাম দিয়াছেন। সেই নামটি ঈশ্বর। শ্রীগীতা এই ঈশ্বরকে কখন বলেন নির্গুণ ব্রহ্ম, কখন বলেন সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ বা অন্তর্য্যামী কখন বলেন অবতার, কখন বলেন আত্মা। বস্তুটি এক, তবে যে পার্থক্য তাহা উপাধি অবলম্বনে। যিনি সর্ব্বপ্রকার উপাধি-শূন্য, যিনি আপনিআপনি, যিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম।

যিনি সর্ব্বদা আপনিআপনি ভাবে থাকিয়াও মায়াকে আশ্রয় করিয়া মায়াধীশ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্য্যামী, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী তিনিই সগুণ ব্রহ্ম।

এই সগুণ ঈশ্বরই বহুভাগপ্রাপ্তা মায়া বা অবিদ্যার বশে মায়াধীন জীব বা জীবাত্মা।

এই মায়াধীশ ঈশ্বরই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সৃষ্টির ছন্দঃস্থাপন জন্য মায়া-মানুষ বা মায়া-মানুষী বা অবতার।

যিনি সাধ্যবস্তু তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, অবতার এবং আত্মা সমকালে। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের ভিতরে সর্ব্বদা সেই তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বানুভু, অবিজ্ঞাত স্বরূপ, অবতার-স্বরূপ আত্মা সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

লোকে নানাভাবে ইঁহাকেই ডাকে। বিশ্বাসে লোকে যাঁহাকে ডাকে,

বহিরঙ্গ কর্ম্মে যাঁহাকে ডাকে, অন্তরঙ্গ কর্ম্মে যাঁহাকে ডাকে এবং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া নিঃসঙ্গ ভাবে ধ্যান-যোগে যাঁহাতে স্থিতিলাভ করে, তিনিই সাধ্যবস্তু, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই শ্রীভগবান্। আমরা পরে ইহা বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছি। এখানে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনিই জগতের উপাসনার বস্তু। এই সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে বলিতে হয়—

(১) সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি যাহা অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম।

(২) সৃষ্টি হইলে ইনি যাহা অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর।

(৩) সৃষ্টির অসচ্ছন্দতা নিবারণ জন্য ইনি যাহা অর্থাৎ অবতার।

(৪) সকল সময়ে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ইনি যাহা অর্থাৎ আত্মা।

শ্রীশৈব মহাপুরাণে জ্ঞান-সংহিতার পরিপাটিকা-নামক প্রথম অধ্যায়ে ঋষিগণ সূতকে ঠিক এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন।

সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং কথং দেবস্তন্মধ্যে চ কথং পুনঃ।
তদন্তে চ কথং তিষ্ঠেচ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ॥ ১।৯

জগতের মঙ্গলবিধাতা শঙ্কর সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির স্থিতি কালে এবং সৃষ্টির অন্তে কিরূপে থাকেন? ইহার পূর্ব্বের প্রশ্নটিও এই :—

অগুণো গুণতাং যাতঃ কথং লোকে মহেশ্বরঃ।
শিবতত্ত্বং বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিচারতঃ॥ ১।৮

এই লোকে মহেশ্বর নির্গুণ হইয়াও সগুণ হন কিরূপে? শিবতত্ত্ব আমরা সকলে সবিশেষ অবগত নহি।

(৪)

শ্রুতি অনুসরণ করিয়া শ্রীগীতা বহু স্থানেই নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও আত্মার কথা বলিয়াছেন। আমরা মূল গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। এখানে ঐ বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভগবান্ শঙ্করের মত অবলম্বন করিয়া অনেকেই বলেন "সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। ব্রহ্ম বিষয়ে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় প্রকার শ্রুতিই আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি সবিশেষলিঙ্গ শ্রুতি। আবার তিনি

স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ইত্যাদি নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি।

শ্রীগীতাও যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিতেছেন, তাঁহাকেই সবিশেষ ব্রহ্ম বলিতেছেন; আবার তাঁহাকেই আত্মা ও তাঁহাকেই অবতার বলিতেছেন। শুধু গীতা কেন, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস তন্ত্র—সর্ব্বশাস্ত্রেই এক কথা। তথাপি ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নির্গুণ, সগুণ, অবতার, আত্মা লইয়া কতই মতামত তুলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ কত বাদই এই বেদবিশ্বাসী জাতির মধ্যে উঠিয়াছে। আমরা বলিতে চাই, সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি না দেখাই এই সমস্ত বাদ উঠিবার হেতু। আমরা মূলগ্রন্থে বহু স্থানে এই মত সমূহের সামঞ্জস্য কোথায় তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভগবান্ শঙ্করকেও একটা সম্প্রদায়-ভুক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তাঁহারা বলেন,—ভগবান্ শঙ্কর একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই স্বীকার করেন। যদি তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই না মানিতেন তবে শ্রীগীতার উপক্রমণিকাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে কিরূপে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে এত কথা লিখিয়াছেন? ফলে ভগবান্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস ও শঙ্কর এক ভাবেই বেদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাঁদের সকলেরই অভিপ্রায় এই যে, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই সমকালে সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও আত্মা। আমরা পরে দেখাইতেছি ব্রহ্মের সমকালে এই চারি অবস্থা কিরূপে সম্ভব হয়? এবং যাঁহারা বলেন—সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার স্বরূপের ধ্বংস হয়, এই কথাতে কোথায় এই আধুনিক ধার্ম্মিকগণের বিচারে দোষ থাকিয়া যাইতেছে। আমরা পরে ইহারও আলোচনা করিতেছি। এখানে আমরা ইহা বলি যে, বেদ এবং বেদপ্রমুখ সমগ্র আর্য্যশাস্ত্র বলেন যে, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই সমকালে সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও আত্মা। ইহাতে আমরা মূল কথাটি কি পাই? পাই এই যে, ব্রহ্ম যিনি তিনি সর্ব্বকালেই নিঃসঙ্গ পুরুষ। যখন তিনি সগুণ হয়েন বা অবতার হয়েন বা জীবাত্মা হয়েন, তখনও তিনি নির্গুণ, নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ নির্গুণ অবস্থাটিই তাঁহার স্বরূপ। এই স্বরূপে তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও মায়া অবলম্বনে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাতে যেন ভাসেন। স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও, তিনি সগুণ ব্রহ্ম, অবতার, আত্মা যেন হয়েন। মায়াকে আশ্রয় করিয়াই সেই অক্ষর অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মই কখন যেন ঈশ্বর, অন্তর্যামী, প্রাজ্ঞ

পুরুষ, কখন বা হিরণ্যগর্ভ, তৈজস পুরুষ, কখন বা তিনিই যেন বিরাট, বৈশ্বানর পুরুষ। অন্যরূপে তাঁহার ভাসা, সেটা "স্বয়মন্যমিবোল্লসন্" সে কেবল মায়া সাহায্যে। অথচ মায়া একটা স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প-শক্তি মাত্র। কোন কিছু অগাধ সীমাশূন্য বস্তু থাকিলেই তাহাতে যে স্পন্দন বা কম্পনের মত একটা বোধ হয় তাহাই মায়া, তাহাই শক্তি, তাহাই ইন্দ্রজাল।

যাঁহারা বলেন, শক্তিশূন্য ব্রহ্ম বলিয়া কিছুই নাই, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত অথবা শক্তি অন্য কোথাও থাকেন? শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। যতদিন জগতে অজ্ঞান আছে, ততদিন শক্তিও আছেন। কিন্তু অজ্ঞান ভঙ্গে ব্রহ্ম যখন আপন স্বরূপে, আপনার আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করেন, তখন শক্তি কোথায় থাকেন? ব্রহ্ম যখন মায়াতীত অবস্থায় থাকেন তখন মায়া কোথায় অবস্থান করেন?

শক্তি যিনি, তিনি স্পন্দনাত্মিকা। আর ব্রহ্ম যিনি, তিনি সর্ব্ব প্রকার চলন-শূন্য, পরম শান্ত, জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্ম যিনি তিনি স্থিতি, আর শক্তি যিনি তিনি গতি। স্থিতিতে গতি থাকিবে কিরূপে? জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে কিরূপে? আলোকে অন্ধকারের অধিষ্ঠান কিরূপে হয়? যাঁহাকে নির্গুণা শক্তি বলা হয়, শক্তির অব্যক্তাবস্থা বলা হয়—তিনি কি ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছু? শক্তি ও শক্তিমান্ যে এক, সে কথন্? যে ব্রহ্ম স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয়-ভেদশূন্য তাঁহাতে তিনিই আছেন; তাঁহা হইতে পরেও বিভিন্ন যাহা হইবে, তাহার থাকিবার স্থান কোথায়? যিনি পূর্ণ, তিনি নিরাকার। পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি। পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রসারিত হয়। তবে পূর্ণ নিরাকার ব্রহ্ম হইতে অপূর্ণ সাকার এই অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থারূপ বিশ্ব কিরূপে আসিবে? তাই বেদ শক্তিকে মায়া বলেন, ইন্দ্রজাল বলেন। ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বদাই আপনি আপনি। তাই ভাগবত বলেন, "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকম্" তিনি আপন মহিমায় মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিরূপ কুহক নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদাই আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত। মায়ার কুহক তাঁহাকে কোন কালেই অন্যরূপে বিকার প্রাপ্ত করিতে সমর্থ নহে। মায়ার কুহকে নির্গুণ ব্রহ্মের যেমন বিকার হয় না, সেইরূপ মায়া সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও আত্মারও কোন বিকার উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে। তবে যে তিনি ঈশ্বর, অবতার ও জীবাত্মা রূপে ভাসেন, সেটা ইন্দ্রজাল মাত্র। "ময়ি জীবত্বমীশত্বং

কল্পিতং বস্তুতো নহি” ইহাও শ্রুতিবাক্য। সেই জন্যই বলা হয়, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্রহ্ম থাকিয়াও সমকালে মায়া দ্বারা সগুণ, অবতার ও আত্মারূপে ভাসেন। যেমন রজ্জু, সর্ব্বদাই রজ্জু থাকিয়াও সর্পরূপে ভাসে অথচ সর্প বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম চিরদিনই ব্রহ্মরূপে থাকিয়াও যেন বিশ্বরূপে ভাসেন মাত্র।

এখন দেখা যাউক, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েন কিরূপে? পরে দেখা যাইবে, তিনি অবতারই বা কিরূপে হয়েন এবং জীবাত্মাই বা হন কিরূপে?

আমরা ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের যুক্তি অনুসরণ করিয়া নির্গুণের সগুণ ভাব-ধারণ বা ব্রহ্মের বিশ্বরূপে ভাসা কিরূপ, তাহার আলোচনা করিতেছি।

সমস্ত জীবের যে সুষুপ্তি অবস্থা—সেই সুষুপ্তি অবস্থা-সমূহের সমষ্টি যখন হয়, তখন প্রলয়াবস্থা ঘটে। সেই সুষুপ্তি-স্থানই সগুণ ব্রহ্ম। তুরীয় যিনি, তিনি নির্গুণ। সুষুপ্ত ও তুরীয়ের সম্বন্ধ এত নিকট যে, সুষুপ্তস্থান হইতে সৃষ্টি কিরূপে ভাসে, এই অবস্থা হইতে যে ক্রমে সৃষ্টি হয় তাহার কথা আলোচনা করিলে,আমরা নির্গুণের সগুণরূপে ভাসা কিরূপ,তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিব। কিন্তু বিনা সাধনায় এই আত্মতত্ত্ব লাভ কিছুতেই হইবে না।

তস্যানন্তপ্রকাশাত্মরূপস্যানন্তচিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ॥
তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং-মর্শনপূর্ব্বকম্॥
ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিতরূপকম্।
আকাশাদণু শুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্॥

মণির সহিত ব্রহ্মের একদেশের সাদৃশ্য আছে। তবে মণি শান্ত কিন্তু চিন্মণি অনন্ত। মহাপ্রলয়ে যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন, অনন্ত-প্রকাশই তাঁহার আত্মরূপ। তিনি অনন্ত প্রকাশ-স্বরূপ। অনন্ত চিৎস্বরূপ মণি তিনি। আর এই বিশ্ব? এই বিশ্ব কি? অনন্ত চিন্মণিতে এই বিশ্ব কোথায় থাকে?

এই বিশ্ব সেই অনন্ত প্রকাশস্বরূপ অনন্তচিন্মণির সত্তামাত্রাত্মক। এই বিশ্ব স্বভাবতঃ অজস্র ভাসে ব্রহ্মসত্তা অবলম্বন করিয়া উঠিতেছে লয় পাইতেছে।

যে হেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তামাত্রাত্মক—যে হেতু সেই চিন্মণির পরমার্থরূপটি মাত্রই এই বিশ্বের সত্তা—সেই হেতু মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ উঠে, আবার লয় পায়, আবার উঠে—সেইরূপ সেই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বভাবতঃ

একটি ঝলক একটি চেত্যতা—একটি বহির্ম্মুখতা—যেন উঠে। সীমাশূন্য অগাধ কোন কিছুতে যেন একটা স্পন্দন, একটা কম্পন উঠে বলিয়া মনে হয়। যে বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তাতে যেন সুপ্ত থাকে, যে বিশ্ব তখনও উঠে নাই, তখনও নাম রূপের রেখাপাত মাত্রও হয় নাই, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে চিন্মণির সত্তা আপনাতে আপনি কিঞ্চিৎ চেত্যতা, কিঞ্চিৎ বহির্ম্মুখতা, কিঞ্চিৎ সৃষ্টি-বিষয়ক ইচ্ছা, কিঞ্চিৎ স্পন্দন যেন প্রাপ্ত হয়েন। ইহা স্বভাবতঃই হয় বলিয়া মনে হয়। এই চেত্যতাটি কিন্তু সম্বিৎদ্বারা—জ্ঞানদ্বারা—চিৎদ্বারা অহং স্পর্শ এখনও করে নাই। চিৎদ্বার অহংস্পর্শ করিয়া সাধারণ বস্তু যেরূপ নামরূপ গ্রহণ করে, সেইরূপ এখনও তাহা করে নাই। ইহা অহং-মর্শনপূর্ব্বকং অগৃহীতাত্মকম্। সেই চিন্মণির সত্তামাত্রটি—নামরূপ গ্রহণের পূর্ব্বে যেরূপে থাকেন, তাহা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, শুদ্ধ বোধ মাত্র। এই শুদ্ধ বোধটি একদিকে নির্গুণ ব্রহ্ম স্পর্শ করিয়া থাকে, অন্যদিকে ইহা সমস্ত সৃজ্য বিষয়ের ভাবি-নামরূপ-অনুসন্ধান-তৎপর। ঐ ভাবি-নামরূপ অনুসন্ধান দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপাভাস-বিশিষ্ট হইয়াই সেই সত্তাটি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন।

মহাপ্রলয়ে স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ শুদ্ধবোধরূপ যে ব্রহ্মসত্তা, এই বিশ্ব মূলে সেই সত্তামাত্রাত্মক।

বিশ্বের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। ইহা সেই ব্রহ্মের সত্তা অবলম্বন করিয়াই ভাসে মাত্র।

কিরূপে ভাসে তাহা শ্রবণ কর।

সত্তা—অস্তিতা—আছে এইভাব—এই শুদ্ধ বোধ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাবের সহিত এই সদ্‌ভাব জড়িত। ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দ ভাব সর্ব্বত্র সকলের অনুভবে ভাসেনা কিন্তু এই সদ্‌ভাব অস্তিতাভাব—আছে এইভাব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সৃষ্টির পূর্ব্বেও অস্তিতার অবিদ্যমানতা চিন্তা করা যায়না। সৃষ্টির পরে আছে এই ভাবটি কোন কিছু হইতে লোপ করা যায় না। সৎ, চিৎ, আনন্দ সগুণ ব্রহ্মের বিশেষণ কেহ কেহ ইহা বলেন। কিন্তু ইহা বলায় কোন দোষ হয় না যে, সৎ-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ যিনি, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। জ্ঞান-স্বরূপ বলিলে কি বুঝা যায়? সুষুপ্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম লয় হইলে যখন বিশ্ব থাকে না, বিশ্ব অনুভবে আইসে না—যখন আর কিছুই নাই এই অভাবের অনুভব হয়। তখনই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হয়। বিশ্বের অভাব অনুভব হওয়াই আপনি আপনি ভাব প্রাপ্ত হওয়া। আর

কিছুই নাই ইহা অনুভূত হওয়ারই অন্য নাম আপনি আপনি থাকা। জ্ঞেয় বস্তু নাই অর্থই জ্ঞান-স্বরূপটি থাকা। ইহা শূন্য নহে। ইহাই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। জ্ঞেয় কোন কিছুই নাই অথচ শুদ্ধ জ্ঞান আছে—এই জ্ঞেয় বস্তুর অনুভব-বর্জ্জিত যে শুদ্ধ জ্ঞান, তাহাকেই জ্ঞান-স্বরূপ বলা যায়। জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ যিনি, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বস্তু জড়িত, আনন্দের সহিত আনন্দের বস্তু জড়িত বলিয়া জ্ঞান ও আনন্দকে সগুণব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয়, কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ যিনি, আনন্দ স্বরূপ যিনি, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। এই জন্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ যিনি, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের সহিত নির্গুণ ব্রহ্মের বড়ই নিকট সম্বন্ধ, তাহা এই জন্য। এই অতি সূক্ষ্ম বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই, মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি, প্রায় স্থানেই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের এক স্থানেই, এক শ্লোকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কঠশ্রুতি ২য় বল্লী ২১ শ্লোকে বলেন :—

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।

আত্মা অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, শয়ান—ক্রিয়ারহিত হইয়াও সর্ব্বত্র-গামী। ভগবান্ শঙ্কর ভাষ্যে বলেন—অয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যানিত্যাদি বিরুদ্ধানেকবিধধর্ম্মোপাধিকত্বাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাদ্ বিশ্বরূপইব চিন্তামণিবদ্ভাসতে।

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২

আকাশের মত শরীর নাই কিন্তু শরীরে অবস্থিত, অনবস্থাতে—অবস্থিতি-রহিতে—অনিত্যে নিত্য অবস্থিত। অবিকৃত ও মহৎ এবং বিভু—সর্ব্বব্যাপী। এই আত্মাকে 'আমি এইরূপই' ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশ। ৪

তিনি চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন। তিনি অতি দূরে অথচ অত্যন্ত নিকটে। সর্ব্ব জগতের অন্তরে বাহিরেও তিনি।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব কর্কটী প্রশ্নে বলিতেছেন :—

"কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিং ভবেৎ"।

কে সমস্ত অথচ কিছুই নয়? কে আমি অথচ আমিও নয়? ইত্যাদি।

শ্রীগীতাও বলিতেছেন :—

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৩।১৪।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়ের যে গুণ—বুদ্ধির অধ্যবসায়, মনের সঙ্কল্প, কর্ণের শ্রবণ, বাক্যের বচন ইত্যাদি এই সমস্ত গুণ দ্বারা যেন ভাসেন, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত—তিনি সর্ব্বসম্বন্ধ-বিহীন বলিয়া অসক্ত অথচ সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, পালন করিতেছেন, তিনি গুণরহিত কিন্তু গুণের উপলব্ধি করেন। তিনি "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" তিনি সাক্ষী, তিনি চেতন, তিনি কেবল, এবং নির্গুণ। গীতা আরও বলেন :—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥

ভূতগণের অন্তরে বাহিরে তিনি, অচল বস্তুও তিনি আবার গমনশীলও তিনি। তিনি সূক্ষ্ম, রূপাদি-বর্জ্জিত বলিয়া অবিজ্ঞেয়। আত্মজ্ঞান-সাধন-শূন্যের পক্ষে তিনি দূর দূরান্তরে, আর আত্মজ্ঞান-সাধন-সম্পন্নের তিনি অতি নিকটে। শ্রীগীতার এই সমস্ত কথা শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি।

বলিতেছিলাম—বিশ্বটা যাহাই হউক না কেন, ইহা ব্রহ্মের যে সদ্‌ভাব—আছে ভাব—অস্তিতাভাব সেই সত্তামাত্রাত্মক। ব্রহ্মসত্তাই বিশ্বকে সত্তা দিতেছে। ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন বিশ্বের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই।

ব্রহ্মসত্তা বিশ্বকে সত্তাবান্ করেন কিরূপে?

রজ্জুতে সর্প বোধটা যেমন ভ্রম-কল্পিত মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ বোধটাও ভ্রম-কল্পনা মাত্র। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্" ব্রহ্ম আপন মহিমায় মায়ার কুহক সর্ব্বদা নিরস্ত করিয়া সত্যরূপে, আপনি আপনি ভাবে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মের এই শুদ্ধ বোধরূপ অস্তিভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই মায়া এই বিশ্ব-কুহক দেখাইতেছেন। "যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা" এই সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা মায়িক রচনা মিথ্যা হইলেও, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মসত্তা মূলে আছেন বলিয়া জগৎ সত্যমত বোধ হইতেছে।

যদি জিজ্ঞাসা কর—অতি নির্ম্মল, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, শুদ্ধ বোধ-স্বরূপ শুদ্ধ সত্তামাত্র যাহা, তাহা এই স্থূল সমল বিশ্বরূপে ভাসেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয়, ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। ব্রহ্মকে চিন্মণি বলা হইয়াছে। চিন্মণি চিরদিন

আপন স্বরূপে অবস্থিত। মণি হইতে স্বভাবতঃ যেমন ঝলক উঠে, সেইরূপ এই অনন্ত চিন্মণি হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা উঠার মত বোধ হয়, তাহাকে মায়া বলা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অগাধ কোন কিছু থাকিলে তাহাতে একটা স্পন্দন, একটা কম্পন উঠার মত বোধ হয়। বায়ু ও স্পন্দন, চন্দ্র ও চন্দ্রিকা যেমন অভিন্ন ইহাও যেন তাই। মণিতে যেমন ঝলক স্থিতিলাভ করে না, আর ঝলকটা যেমন মণিতে আছেও বলা যায় না, নাই বলাও যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মে মায়া আছেন বলাও যায় না, নাই বলাও যায় না। অথচ একটা ভাবরূপ পদার্থ ব্রহ্ম-সত্তা অবলম্বনে যেন ভাসে। ইহাই মায়া। এই অব্যক্ত মায়া, একীভূত সুষুপ্তির বিচিত্র স্বপ্নরূপে ভাসার মত ব্রহ্ম পদার্থে বিচিত্র রূপেই ভাসেন। ভাসিলে অতি সূক্ষ্ম অতি নির্ম্মল ব্রহ্মকে যেন বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসিতে দেখা যায়। মায়ার যে গুণে ব্রহ্মকে সৃষ্টিরূপে ভাসার মত দেখা যায়, তাহাই মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি। আবার মায়ার দ্বিতীয় যে গুণটি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদকে আবরণ করিয়া, দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার অভেদ-ভাব স্থাপন করে, তাহাই মায়ার আবরণ-শক্তি। যেরূপে আবরণ-শক্তির কার্য্য হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপন মায়া-শক্তি আশ্রয়ে যেন বহুধা ভিন্ন হইয়া জগদাকার ধারণ করেন। এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও বিশ্বরূপে যেন বিস্তার লাভ করেন, যেন বিবর্ত্তিত হয়েন। "তনু বিস্তারে" বিস্তারার্থক তন্ ধাতু হইতেই তৎপদ হইয়াছে। তৎ এর ভাব যাহা তাহাই তত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্বই তবে সৃষ্টি বা জগতের স্বরূপ, স্বভাব, আপনি আপনি ভাব। বিশ্বের যে কোন বস্তু লওনা কেন, তাহার স্বরূপাবস্থায় পৌঁছিতে পারিলেই ব্রহ্মভাব লাভ হইবেই। কোন বস্তুর স্বরূপ-চিন্তাই তবে ব্রহ্ম—চিন্তা।

ঝলক-জড়িত মণি—মায়াশবলিত ব্রহ্ম কোন্ অপূর্ব্ব ক্রমে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসেন, এখন তাহা লক্ষ্য কর। তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু।

সর্ব্বাত্মক সুষুপ্তি-স্থানই ব্রহ্ম। ইনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ। ইঁহাদের সম্বন্ধ অতি নিকট বলিয়া, ইনিই অখণ্ড অনন্ত চিৎস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ। ইনিই চিন্মণি। এই চিন্মণির পরমা সত্তাই বিশ্ব।

এই পরমা সত্তা চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন, স্বভাবতঃ হয়েন। সম্বিদা অহং-মর্শনপূর্ব্বকম্, অগৃহীতাত্মকং অহংকারাধ্যাসং বিনাকাশাৎ অণু শুদ্ধঞ্চ কিঞ্চি-দুহিতানি রূপকাণি যস্মিংস্তথাবিধং সৎ চেত্যতামিব গচ্ছতি।

ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতা শ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথা॥

সেই পরমা সত্তা যখন চেত্যতা লাভ করেন, তখন সেই চেত্যতার মধ্যে ভাবিনামরূপানুসন্ধান বৃত্তি থাকে। ভাবিনামরূপানুসন্ধান বৃত্তি দ্বারাই ঐ ব্রহ্ম সত্তা, ঐ শুদ্ধবোধ কিঞ্চিৎ উহিতরূপ ধারণ করেন।

তস্যেক্ষণবৃত্তি-তদ্বিষয়োপাধিভ্যামীশ্বরজীবভাবৌ দর্শয়তি তত ইতি। চেত ঈক্ষণাত্মিকা বৃত্তিস্তৎসহিতা চেতনা তদভিব্যক্তচৈতন্যং তদুন্মুখী তৎপ্রধানা সতী চেতয়তীতি চিৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্তন্নামযোগ্যেত্যর্থঃ। বাক্ প্রবৃত্তিবিষয়ধর্ম্ম-বত্বেন বাগ্‌ব্যবহার-লভ্যতয়া।

ঘনসম্বেদনা পশ্চাৎ ভাবি-জীবাদিনামিকা।
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্॥

চিরানুবৃত্ত্যা ঘনা দৃঢ়ীভূতা ঈক্ষণসম্বেদনা যস্যা স্তথাবিধা সতী আত্তা গৃহীতা কলনা তদ্বিষয়সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মভাবলক্ষণপরিচ্ছেদকলনা যয়া অতএব পরং পদম-পরিচ্ছিন্নভূমাত্মভাবং বিস্মরণেনোজ্ঝতি তদা ভাবিপ্রাণধারণোপাধিকজীব-হিরণ্যগর্ভাদিনামিকা সম্ভবতীত্যর্থঃ।

ব্রহ্মসত্তা চেত্যতা প্রাপ্ত হইবার পরে যাহা হয় তাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

মায়া-জড়িত পরব্রহ্ম জগদাকার ধারণ করিবার সময় যেরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন সারদা তিলক তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

পরঃ শক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্ম্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥

মায়াময় বা শক্তিময় পরব্রহ্ম বিন্দু নাদ ও বীজ এই তিন প্রকারে ভিন্ন হয়েন। কিরূপে হয়েন পরে আলোচনা করা হইতেছে। এখানে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় পরিষ্কার করা আবশ্যক।

মায়া ও শক্তি কি এক বস্তু? মায়াকে যেমন মিথ্যাই বলা হয় শক্তিকেও কি তাহাই বলিতে হইবে? সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্ম ইহার অর্থ কি মায়াজড়িত

ঈশ্বর ? যে শক্তি লইয়া বিজ্ঞান এত কাণ্ডপ্রকাণ্ড করিতেছেন, সে শক্তিকে মায়া বলা যায় কিরূপে ? শক্তি যদি মায়াই হয়, তবে শক্তির উপাসনা আমাদের শাস্ত্রে এত বিস্তার লাভ করিল কিরূপে ?

চিৎশক্তি, হ্লাদিনী শক্তি—শাস্ত্রে এইরূপ পাওয়া যায়। চিৎ-বলে জ্ঞানকে, হ্লাদিনী শক্তিকে আনন্দকে লক্ষ্য করা হয়। জ্ঞান স্বরূপ যিনি, আনন্দস্বরূপ যিনি, তিনি সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত। কিন্তু শক্তি যাহা, তাহা স্পন্দরূপিণী। তবে চিৎটিই শক্তি কিরূপে ? স্থিতিটিই গতি কিরূপে ? চিৎশক্তি যখন বলা হয়, তখন শক্তি জড়িত চিৎ বুঝিতে হইবে। মায়াজড়িত ব্রহ্মও যাহা, শক্তিজড়িত চিৎ তাহাই। চিৎ-শক্তির অন্য একটি নাম মহানিয়তি। ইহা স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী। এই চিৎশক্তি বা মহানিয়তি আদি সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত হয়। মহানিয়তি বলে ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎ সমূহ তৃণের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে গীতায় শক্তি সঞ্চার প্রবন্ধে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে আরও বলা হইয়াছে যে, মহানিয়তি সর্ব্বকালগামী ও সকল বস্তুব্যাপী। ইহা বিশুদ্ধ ঈশ্বর সঙ্কল্প। ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা বা সঙ্কল্পকেও আদি স্পন্দন বলা হয়।

এখন দেখা যাউক শক্তি উপাসনা সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন। দেবী-ভাগবতে পাওয়া যায় :—

ভগবন্ দেবদেবেশ মিথ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ॥
শ্রদ্ধা ন জায়তে ক্বাপি মিথ্যা বস্তুনি কুত্রচিৎ।
দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো॥

ভাবার্থ এই :—শ্রীপার্ব্বতী দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে প্রভো! মায়া যাহা, তাহা ত মিথ্যা। তবে মায়া, শক্তি বা দেবীর উপাসনা কিরূপ ? আবার মিথ্যা মায়ার উপাসনা হইতে মুক্তিলাভ হয় কিরূপে ? মিথ্যা বস্তুর উপরে কখন শ্রদ্ধা জন্মে না। দেবীর উপাসনা যদি মায়াশ্রিতাই হয়, তবে তাহাতে শ্রদ্ধাই বা জন্মে কিরূপে আর সে উপাসনায় লাভই বা কি হইতে পারে ? উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন :—

নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে ক্বচিৎ।
মায়াধিষ্ঠান-চৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্॥

সুমুখি! মায়াকে উপাসনা করিতে হইবে ইহা আমি কোথাও বলি নাই। কিন্তু মায়া-উপহত যে চৈতন্য তাহাই উপাস্য—এই কথাই সর্ব্বত্র বলিতেছি। শক্তি তত্ত্ব কি, পরে আলোচনা করা যাইতেছে, কিন্তু শক্তি-উপহত চৈতন্যই উপাস্য। শক্তি ও শক্তিমান্‌কে কোন্ অবস্থায় এক বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে একাধিক বার বলা হইয়াছে।

এখন ব্রহ্মই যেরূপে বিন্দু নাদ ও বীজরূপে বিবর্ত্তিত, তাহার কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

মায়াকে সঙ্কল্পরূপিণী স্পন্দরূপিণী ইত্যাদি বলা হয়। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। তিন পাদ সদা শান্ত—সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত। এক পাদে মায়ার স্পন্দন মত লক্ষ্য করা হয়। ব্রহ্মের যে পাদে মায়ার স্পন্দন উঠে, তাহা চতুষ্পাদ ব্রহ্মের তুলনায় বিন্দুমাত্র। ব্রহ্মের তুলনায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রসব স্থান এই বিন্দু অতি ক্ষুদ্র। ইহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়াও ইহাকে বিন্দু বলা হয়। মায়া-জড়িত ব্রহ্মই বিন্দু। স্পন্দনজড়িত চৈতন্যই বিন্দু। জ্ঞানজড়িত স্পন্দনই এখানে লক্ষ্য। যেখানে স্পন্দন, যেখানে চলন সেখানে শব্দও অবশ্য থাকিবে। কাজেই জ্ঞানের শব্দত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। আবার শব্দ হইতে যে এই বিশ্ব জাত, শাস্ত্র তাহাও উল্লেখ করেন। শব্দের চারি প্রকার অবস্থা। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। কুণ্ডলিনীরূপে অব্যক্ত অবস্থায় যে শক্তি তাহা পরা। নাভিতে যোগিগণ ইহাকে দেখিতে পান বলিয়া ইহা পশ্যন্তী। শব্দ হৃদয়ে আসিয়া মধ্যমা ও শব্দ যাহা জীব সকল উচ্চারণ করে তাহা বৈখরী।

অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥ বাক্যপদীয়।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপে পূজ্যপাদ গ্রন্থ এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া যাহা বলিতেছেন, নাদবিন্দু ও বীজের মর্ম্ম গোচরার্থ এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান স্বকীয়রূপের অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শব্দ (ভেদ সংসর্গবৃত্তি শক্তি) মনোভাব-প্রাপ্ত ও তেজের দ্বারা পরিপক (অনুগৃহীত) হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হয় এবং বায়ু, অন্তঃকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে তদ্ধর্ম্ম সমাবিষ্ট হইয়া তেজদ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদ সংসর্গবৃত্তি শক্তি। শব্দ নিত্য ও কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। কার্য্যশব্দ সগুণ ব্রহ্ম। নিত্য শব্দ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন।

শব্দ হইতে জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য পূজ্যপাদ নাগেশ ভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জুষা গ্রন্থে বলিয়াছেন—

প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন প্রলয়ালীন সর্ব্বজগৎকামায়াচেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃ প্রাদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। * * । অপরিপক্কপ্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ ফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টিমায়াপুরুষৌ প্রাদুর্ভবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়া বৃত্তি র্জায়তে। ততোবিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশো বীজম্। চিদচিন্মিশ্রোংশো নাদঃ। অচিচ্ছব্দেন শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপাঽবিদ্যোচ্যতে। অস্মাদ্বিন্দোঃ শব্দ-ব্রহ্মাপরনামধেয়ম্।

নিয়মিত কালপরিপক্ক নিখিল প্রাণিকর্ম্ম, উপভোগদ্বারা প্রক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া, স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়। লয় হয় বলাতে একবারে প্রধ্বস্ত হয় বলা হইল না। লয়, প্রাদুর্ভাবফলক, ইহা আত্যন্তিক নাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে, প্রাণীদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্ম সকল যখন ফলদানে উন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্ট মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়—পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা মায়া-বৃত্তির বিকাশ হয়। তৎপরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। বিন্দুর অচিদংশ বীজ এবং চিদচিন্মিশ্রাংশ নাদ। "অচিৎ" এই শব্দদ্বারা শব্দার্থোভয় সংস্কাররূপা অবিদ্যা লক্ষিত হইয়াছে। চৈতন্যাধিষ্ঠিত —প্রকৃতি—বা শক্তির পুংকালাদি ব্যপদেশেই—ক্রিয়া-প্রধান অবস্থাই নাদ শব্দে অভিধেয়। এই বিন্দু-নাম-লক্ষিত পদার্থের অপর নাম শব্দ ব্রহ্ম।

শব্দ তবে কি? আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ বলেন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার নাদাভিব্যক্ত—নাদদ্বারা বহিঃ প্রকাশিত অবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ শব্দ বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

সারদাতিলক বলিতেছেন, বিন্দু যাহা, তাহা শিবাত্মক। বীজ যাহা, তাহা শক্ত্যাত্মক এবং নাদ যাহা, তাহা শিবশক্ত্যাত্মক বা চিদচিদাত্মক। শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্ময়া নাদসংজ্ঞঃ সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ। প্রণবের মধ্যে আমরা অ উ ম অর্দ্ধমাত্রা নাদ ও বিন্দু এই ছয় অংশই পাইয়া থাকি।

সৃষ্টিতত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ। যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা সাধনাসম্পন্ন হইয়া

চিন্তা যদি করেন, তবে যথার্থ ভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সাধারণ পাঠকের জন্য প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ শ্রীগুরু ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আমরা বলিতেছিলাম, নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মই আছেন। কিন্তু মায়া অবলম্বনে তিনি আপনস্বরূপে নিত্য: অবস্থান করিয়াও সগুণরূপে প্রতিভাত হয়েন। আবার ইনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও জীবে জীবে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহাও পূর্ব্বে শ্রুতি স্মৃতি হইতে দেখান হইয়াছে। শ্রীগীতা জীবাত্মাকেই বলিতেছেন, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" জীব কখন জন্মেন না—মরেনও না—ইহাতে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? আবার, "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" ইহাই বা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? জীবাত্মাই যে উপাধিত্যাগে পরমাত্মা, গীতা সর্ব্বস্থানে ইহা বলিয়াছেন। যিনি নির্গুণ ভাবে জীবমধ্যে 'নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্' হইয়া আছেন, তিনিই আবার ঈশ্বর ভাবে জীব মধ্যে থাকিয়া জীবকে নানারূপে ভ্রামিত করিতেছেন। শ্রীগীতা বলিতেছেন—

> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

এই গুলি গীতার বিরুদ্ধবাদ নহে, পরন্তু নির্গুণ যিনি, তিনিই যে সমকালে সগুণ, আত্মা ও অবতার তাহারই প্রমাণ এই সমস্ত।

নির্গুণ ব্রহ্মই যে আবার সমকালে অবতার, ইহার কথা আমরা অধিক বলিব না। ব্রহ্মের মূর্ত্তি-গ্রহণ হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই ভ্রমসিদ্ধান্ত করেন। যে যুক্তিবলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না; যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উত্থাপিত হইবেক।"

রাজা রামমোহনের এই যুক্তি তাঁহার উপযোগী নহে। কারণ স্বস্বরূপে নিত্য অবস্থান করিয়াও "অহং বহু স্যাম্" যখন তিনি হয়েন, তখন রাজার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ ধ্বংসের ভয় কেন উৎপন্ন যে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একজন মানুষ এক এক দিনে কত কোটি কোটি সঙ্কল্প করে। কিন্তু একটি সঙ্কল্পে অভিমান করিয়া যখন সে কার্য্য করে, তখন তাহাকে ঐ সঙ্কল্পের মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি অনন্ত কোটি সঙ্কল্পের মূর্ত্তি, সে একটিতে অভিমান করিয়াও যখন আপন স্বরূপের ধ্বংস করে না, বরং স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও একটা মাত্র সঙ্কল্পে মূর্ত্তিমান্ হয়েন, একটা মানুষের পক্ষে ইহা যখন অসম্ভব নহে, তখন ব্রহ্ম যে মায়ার সাহায্যে আপন স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া বহুমূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যাত্রার দলের বালক কৈবর্ত্ত থাকিয়াও যদি কৃষ্ণের অভিনয় করিতে পারে, বৃদ্ধ বৃদ্ধ থাকিয়াও বালক সাজিয়া যদি ঘোঁড়া ঘোঁড়া খেলিতে পারে, অথবা ধর্ম্মযাজক বালক কাল হইতে কত কি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বদা জানিয়াও যদি ধার্ম্মিক হইয়া বেদীর উপরে বসিয়া ধর্ম্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও রাম কৃষ্ণাদি অবতার হইয়া লীলা করিতে পারেন না—ইহা কি শ্রদ্ধার কথা? পূর্ব্বে আমরা গীতার বিশেষত্ব প্রবন্ধে ৩৩ পৃষ্ঠায় অবতার-তত্ত্বের মূল কথা আলোচনা করিয়াছি। আবার এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে নিরাকার সাকার বাদের তত্ত্ব শ্রুতি হইতে আলোচনা করিব। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, অবতার হইতে পারে না এ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় যে শ্লোকটি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তিনি কোথা হইতে তুলিয়াছেন তাহা বলেন নাই কেন? রাজা রামমোহন নিজের মত স্থাপন জন্য যখন যে শাস্ত্র হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

এই শ্লোক কোথাকার তাহা তিনি লুকাইলেন কেন? আমরা যতদূর শাস্ত্র দেখিয়াছি, তাহাতে মহাভারত বা ভাগবত বা তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ইহা কোথাও দেখি নাই। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রি-প্রমুখ বহুপণ্ডিতদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি

তাঁহারাও কোথাও ইহা পান নাই। বরং তাঁহারা শ্লোক শ্রবণ করিয়া বলেন, এই শ্লোক ঋষি প্রণীত নহে। এই শ্লোকটি সর্ব্বশাস্ত্র-বিরোধী। এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় একটা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠন জন্য পণ্ডিতদ্বারা নিজের মনোমত করিয়া ইহা রচনা করাইয়াছেন, ইহাও অনেকে মনে করেন।

আমরা অবতার সম্বন্ধে শ্রীগীতার একটি শ্লোকমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তিনি অজ, অব্যয়াত্মা। তিনি যখন সগুণ তখন ভূত-সকলের ঈশ্বর। এই নির্গুণ সগুণ আত্মাই আবার আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়া দ্বারা মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া অবতার হয়েন। পরের দুই শ্লোকে অবতারের কার্য্য কি তাহারও উল্লেখ আছে।

শ্রীগীতায় উপাস্য নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। যেরূপ ভাবে এই দুরূহ তত্ত্ব আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তবে এখানে বলিবার সব কথাই বলা হইয়াছে। যিনি এই তত্ত্ব আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধনার সহিত কিছুদিন ধরিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে বিশদভাবে সমস্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন—ইহা আমাদের বিশ্বাস।

এক্ষণে আমরা শ্রীগীতোক্ত উপাসনা নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

(৫)

গীতা পূর্ণধর্ম্মের যে যে অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে তাহাই দেখাইতেছি। সকল জাতির ধর্ম্ম ইহারই অঙ্গ। আমরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা হইতে সর্ব্বনিম্ন অবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছি।

(১) অক্ষর, অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

(২) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্বরূপের উপাসনা।

(ক) যোগীর উপাসনা।

(খ) ভক্তের উপাসনা।

(৪) মৎকর্ম্ম-পরম হইবার সাধনা।

(৫) মদ্‌যোগ-আশ্রয়ে সাধনা।

এই পঞ্চাঙ্গে যে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ, তাহাই জগতের পূর্ণ ধর্ম্ম। পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের বিরোধ দেখিবেনই!

বহু অন্ধের হস্তিদর্শনে—যেমন কোন অন্ধের কাছে হস্তী কুলার মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী থামের মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী সম্মার্জ্জনীর মত—কাজেই অন্ধদিগের মতভেদ ও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী—'কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটে সকল অন্ধের মতের মধ্যে যেমন সত্য অংশটি দৃষ্টিগোচর করা সহজ, সেইরূপ পূর্ণ ধর্ম্মটি যিনি দেখিয়াছেন, তিনি জানেন সকল জাতির ধর্ম্মে সত্য অংশ কোন্‌টি আর কোথায় বা অন্ধদিগের বিরোধ হইতেছে।

পূর্ণ ধর্ম্মটি দর্শন করাতে জগতের প্রভূত মঙ্গল আছে বলিয়া মনে হয়। গীতা সেই পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখাইতেছেন বলিয়াই গীতা সকল জাতির আদরের ধর্ম্মগ্রন্থ।

প্রথম—অক্ষর, অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

নির্গুণব্রহ্মোপাসকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। ধার্ম্মিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা এই নির্গুণ উপাসনা দ্বারা অর্জ্জিত হয়।

উপাসনার অর্থ (১) সমীপে থাকা। উপ-সমীপে; আসন-বসা।
(২) স্থিতিলাভ করা।

নির্গুণ-উপাসনায় যে 'উপাসনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ স্থিতি। নির্গুণ নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করাই নির্গুণ উপাসনা। এই শ্রেণীর উপাসক সদ্যোমুক্ত। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতীরূপং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"। নির্গুণ উপাসকের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। এই খানেই প্রাণ বিলীন হইয়া যায়। জীব মৃত্যুকালে শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম-জ্যোতি লাভ করিয়া স্ব-স্বরূপেই অবস্থান করে।

দেখা যায়, মৃত্যুকালে সকল জীবেরই প্রাণ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রাণের উৎক্রমণসময়ে জীব নিদারুণ যাতনা ভোগ করে। নির্গুণোপাসক হইলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না—এই ভাবিয়া যাঁহারা নির্গুণোপাসক শ্রেণীভুক্ত হয়েন—তাঁহারা ঐ উপাসনার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে কিনা যদি ইহার বিচার না করেন, তবে একটা আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া বিড়ম্বিত হন কিনা তাহা সুন্দররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদের দেশে আজকাল অনেক স্ত্রীলোক ও অনেক পুরুষ বিশেষ কিছু তপস্যা না করিয়াই

বলিতে চাহেন "আমি ব্রহ্ম"। আর কিছুই নাই—আমিই আছি। জগৎও মিথ্যা, দেহও মিথ্যা, মনোজগৎও মিথ্যা।

প্রকৃত জ্ঞান যখন এইটি অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—যখন আমি এই জ্ঞান শুনিলাম, তখনই আমার বিশ্বাস জন্মিল একমাত্র সত্যবস্তুই ব্রহ্ম, অন্য সমস্তই মিথ্যা—এই হইলে সোঽহং জ্ঞান আমার জন্মিল। এইরূপ যাঁহাদের বিচার, তাঁহারা যে নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি ও নিতান্ত ভ্রান্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা এই মূঢ়বুদ্ধি মানুষকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাঁহারা অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাঁহাদের সাধন ক্লেশ শুধু অধিক নহে, অন্য অপেক্ষা অধিকতর। যতদিন "আমার দেহ" এইরূপ বোধ আছে, ততদিন নির্গুণব্রহ্ম বা অব্যক্তপদপ্রাপ্তি অতি ক্লেশেই লাভ হয়।

ভাবার্থ এই যে, যাহাদের দেহাভিমান দূর হয় নাই, দেহের সুখ দুঃখবোধ যাহাদের আছে, তাহাদের নিঃসঙ্গ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত ক্লেশকর। নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও একবারে অসম্ভব নহে। কঠোর সাধনা দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করা যায়—যদি কঠোর সাধনা কেহ করে, তবে কঠোরতা ত দূরের কথা—যৎসামান্য সখের চিন্তা ভিন্ন কোনরূপ সাধনাই নাই অথচ আমি সোঽহং হইয়া গিয়াছি এইরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি। জগতের অনিষ্টের জন্যই ইহারা জন্মগ্রহণ করে।

নির্গুণ উপাসনায় ভয়ানক আত্মপ্রবঞ্চনা থাকে বলিয়া আমরা নির্গুণ উপাসনার কথা আরও কিছু আলোচনা করিব।

"আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না"। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান তাহাকে কিরূপে বদ্ধ করিবে" ?

ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠের উক্তি। মূল শ্লোক এই :—

সদেহা বাস্তুদেহা বা মুক্তৃতা বিষয়ে ন চ।
অনাস্বাদিতভোগস্য কুতো ভোজ্যানুভূতয়ঃ॥

বাক্‌সে টাকা আছে এই বিশ্বাস করিলে একটা নিশ্চিন্ত ভাব আসিতে পারে

সত্য ; কিন্তু যতক্ষণ না বাক্সের টাকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হয় না। অপরীক্ষিত বিষয়ে আত্মপ্রতারণা থাকাই সম্ভব।

সেইরূপ আমি আপনিই আপনি এইটি শুধু বিশ্বাস করিয়া রাখিলেই চলিবে না।—অন্য কিছুই নাই ইহাও নিশ্চয় করিতে হইবে। যতক্ষণ আত্মা ব্যতীত বস্তু আছে ততক্ষণ ভোগও আছে। যদি বল, আত্মা ব্যতীত কিছু যদি থাকে, তাহা মিথ্যা বলিয়া যখন জানিয়াছি তখন আর ভোগেচ্ছা থাকিবে কিরূপে? মিথ্যা বিষয়ের ভোগে কি রুচি হয়? সত্য। সেই জন্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, আমি আপনিই আপনি এই ভাবে কতক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে পারি। আপনিই আপনি এই ভাবে স্থিতিলাভ করিলে যদি দেহটা না থাকে, প্রকৃত জ্ঞানী এই ভয়ে কখন স্থিতিলাভে সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। দেহ যখন, মিথ্যা, প্রারব্ধ ভোগাদি সমস্তই যখন মিথ্যা—তখন দেহটা যাইবে বা প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে এই মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া স্বস্বরূপ হইতে দূরে অবস্থান করা বুদ্ধিমানের কথা নহে। স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে গেলে দেহ থাকে না—এই আশঙ্কা প্রকৃত জ্ঞানীর হইতে পারে না। দেহ থাক্ বা না থাক্ উভয়ই যখন মিথ্যা, তখন দেহ রাখার দিকে যত্ন যখন আছে, তখন আত্ম-বঞ্চনা একটু আছে, আসক্তি একটু আছে—ইহাই নিশ্চয়। একটু ভোগের ইচ্ছাও তবে রহিল। তাই বলা হইতেছিল, যতদিন পর্য্যন্ত ভোগত্যাগ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিঃসঙ্গ উদাসীন ভাবে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না।

মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ভোগ করার কোন দোষ হইতে পারে না, ইহাও কাহারও কাহারও যুক্তি। এ ভোগটা যথাপ্রাপ্ত বস্তুর ভোগ মাত্র। ভোগ আসি-লেও যা, ভোগ না আসিলেও তাই। তিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী। দেহটি রক্ষা করিবার জন্য নিত্য ঔষধটি সেবন আছে—ফুরাইয়া গেলে আবার আনাটিও আছে—অথচ বলা হইতেছে ভোগটি মিথ্যা—এইরূপ ব্যবহারে আত্মপ্রতারণা আছেই। ভোগ করাও যা ভোগ না করাও যখন তাই—তখন ভোগত্যাগের দিকেই না হয় রুচিটা হউক, তবেই ত শাস্ত্র মান্য করা হইল।

ফলে যিনি যথার্থ জ্ঞানী তাঁহার ঐশ্বর্য্যগুলিরও বিকাশ হইবেই। তিনি বিভূতি আকাঙ্ক্ষা করেন না সত্য, কিন্তু বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিবেই। এতদ্ভিন্ন যে জ্ঞান সেটা জ্ঞান নহে, জ্ঞানের অভিমান মাত্র অথবা সেটা কপট জ্ঞান। যতদিন না দেহে আত্মবোধ বিগলিত হয়, যতদিন না বহির্জ্জগৎ মন হইতে মুছিয়া যায়, যতদিন না দেহ হইতে, জগৎ হইতে সংস্কার

হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া এ সমস্ত ভুলিয়া না থাকা যায়,ততক্ষণ আপনাতে আপনি থাকা যায় না; ততক্ষণ নির্গুণ উপাসনার অধিকারও জন্মে নাই। এই কারণে সাধনবর্জ্জিত দেহাত্মাভিমানীর নির্গুণ উপাসনা হইতেই পারে না। যে ভাবে স্থিতিলাভ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই, বিনা সাধনায় তাহা লাভ হইতে পারে না। জগৎ নাই, জগৎ নাই, কোটীকল্প ধরিয়া চীৎকার করিলেও মন হইতে জগৎ মুছিয়া যাইবে না অথবা জগৎ মিথ্যা এই বোধ হইবে না। সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ, বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে। আরও বিনা ভক্তিতে ও বিনা বৈরাগ্যে জ্ঞান কিছুতেই জন্মিবে না অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ কিছুতেই হইবে না। শ্রীভগবান্ বলেন—

"মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি॥"

দ্বিতীয় সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। বেদে ব্রহ্মের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে। কিছুই আর নাই, এই জগৎও সৃষ্ট হয় নাই; কেবল ব্রহ্মই আছেন, এই একরূপ; দ্বিতীয় রূপটি হইতেছে জগতে যাহা আছে তাহাই ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অস্তি ভাতি প্রিয়টিই সর্ব্বত্র আছেন; নাম রূপের আবরণটি ইন্দ্রজাল মাত্র। নামরূপটি মায়া মাত্র। এই ব্রহ্মকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাধিগত ভেদ ভিন্ন মূলে কোন ভেদ নাই। অবিজ্ঞাত-স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া-আশ্রয়ে সগুণ হয়েন। সগুণ হইলেও তিনি আপনাতে আপনিই থাকেন; তাঁহার স্বস্বরূপের বিচ্যুতি ক্ষণতরেও হয় না। কেহ বলেন, স্বস্বরূপে থাকিয়াও সগুণ হওয়া—এই উক্তিতে আত্মনাশকর আত্মবিরোধ আছে। আমরা বলি ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধ থাকিয়াও যেমন বালক সাজিতে পারে; নাট্যাভিনয়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোক থাকিয়াও যেমন চামার সাজিতে পারে; যাত্রার দলের বালক, যাত্রার বালক থাকিয়াও যেমন কৃষ্ণ সাজিতে পারে, সেইরূপ তুরীয় ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে অভিমান করিয়া খেলা করিতে পারেন। সগুণ ব্রহ্মের অবতার হওয়াটাও অভিনয় মাত্র। আবার যে অভিনয়ে যত আত্ম-বিস্মৃতির প্রাবল্য থাকে, সেই অভিনয়ই তত স্বাভাবিক হয়। কুকুর অভিনয় করিয়া চিরদিন ঘেউ করা থাকিলে, শৃগাল অভিনয় করিয়া চির দিন ফেউ করা থাকিলেই তবে অভিনয় স্বাভাবিক হইল।

এই গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" আবার

তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন "ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইত্যাদি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া যিনি গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শ্রবণ করেন,—করিয়া যিনি সগুণ ব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া "আমি সমস্ত" এই ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ইহাই।

তৃতীয়—অভ্যাস-যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা। যিনি বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে না পারেন, তিনি কোন একটি অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র করিয়া সেই অবলম্বনটিকেই বিশ্বরূপে ভাবনা করিবেন। অভ্যাসযোগের অবলম্বনটি দুই প্রকারের হইতে পারে। (১) ভিতরের অবলম্বন, (২) বাহিরের অবলম্বন। ভিতরের অবলম্বনটি জ্যোতিঃও হয়, প্রণবও হয় অথবা ভিতরের মূর্ত্তিও হয়। বাহিরের অবলম্বনটি স্থূল মূর্ত্তি বা প্রতিমা। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহাররূপ বহিরঙ্গের সাধনা দ্বারা মনকে বিষয়-শূন্য করেন; করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা অন্তর্জ্যোতিকে বিশ্বরূপে ভাবনা করেন। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারাও ভিতরের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বা বাহিরের স্থূল মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপের আরোপ করিয়া উপাসনা করেন। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও যিনি ভাবনা করিতে পারেন এই মূর্ত্তিই সেই অব্যক্তের মূর্ত্তি; ইনিই অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিদ্যমান আছেন; ইনিই অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং হইয়া আছেন; ইনিই মূলে অবিজ্ঞাত-স্বরূপ, ইনিই আবার সগুণ বিশ্বরূপ—ইনিই মহত্তত্ত্ব, ইনিই অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত; ইনিই মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি, ইনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, ইনিই অন্তর্য্যামী পুরুষ, ইনিই জীবের কর্ম্মফলপ্রদাতা, ইনিই মোক্ষদাতা; ইঁহারই সম্বন্ধে বলা হয়—

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুনঃ, তোঁহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥

ইনিই স্বরূপে সচ্চিদানন্দ, তটস্থ লক্ষণে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা—মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এই ভাবে যিনি অভ্যাসযোগ সাধনা করেন, তিনিও সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করেন; তৎপূর্ব্বে দেহত্যাগ হইলেও শ্রীভগবান্

তাঁহাকে মৃত্যুসংসার-সাগর পার করিয়া দিয়া থাকেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ" ইতি।

চতুর্থ—মৎকর্ম্ম-পরম হইবার সাধনা। যিনি অভ্যাসযোগও না পারেন, তিনি ভগবদ্‌ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম করিবেন। এই সাধক প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম এবং অবতারের কথা শ্রবণ করিবেন,—করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া, শ্রবণ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির কর্ম্মগুলি করিয়া যাইবেন।

শ্রীভগবান্ আছেন এই বিশ্বাসে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার কর্ম্মে ভক্তি জন্মে। একাদশী-ব্রত, শ্রীমন্দির মার্জ্জনা, বিগ্রহের নিকটে দীপদান, পূজার দ্রব্য আয়োজন, পুষ্প-বাটিকা প্রস্তুতকরণ, তুলসীমঞ্চে জলদান, পূজা, ভোগ, আরত্রিক, মন্দির-প্রদক্ষিণ, প্রেমভরে নৃত্যগীতাতি কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তি জন্মে। সর্ব্ব-জীবে শ্রীভগবান্ আছেন—সর্ব্বক্ষণের জন্য ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বজীবের সেবা, কোনরূপে জীবের অবমাননা না করা—এই সমস্ত দ্বারা ক্রমে অভ্যাসযোগে সামর্থ্য জন্মে এবং তদ্দ্বারা বিশ্বরূপের উপাসনাতে পৌছান যায়।

যে সাধক ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার জন্য শাস্ত্র অন্যভাবেও ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্মগুলির নির্দ্দেশ করেন।

(১) সৎসঙ্গ।

(২) সৎকথালাপ—ভক্তিগ্রন্থ চর্চ্চা।

(৩) ভগবানের গুণ স্মরণ।

(৪) উপনিষদাদিতে ভগবদ্‌-বাক্যের ব্যাখ্যা।

(৫) আচার্য্যকে অকপটে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া তাঁহার সেবা।

(৬) পুণ্য কর্ম্ম করা, যমনিয়মাদি সেবা, ভগবানের পূজায় নিষ্ঠা।

(৭) ভগবানের মন্ত্রজপ ও প্রার্থনা।

(৮) ভগবদ্ভক্তের সেবা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, শম বা অন্তরেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ সাধনা।

(৯) তত্ত্ববিচার।

এই সাধনা দ্বারা "ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে" হে শুভ-লক্ষণে এই সাধনা দ্বারা প্রেমভক্তির বিকাশ হইবে।

মানসপূজা, স্বাধ্যায়, যোগ, ভিতরে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারেও ভক্তি জন্মে।

পঞ্চম—মদ্‌যোগ-আশ্রয়ে ফলসন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করা।

যিনি "মৎকর্ম্মপরম" হইতেও পারেন না;—ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম করিতে গেলে যাঁহার মনে হয় "আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবারের উপর কর্ত্তব্য আছে, হাটবাজার আছে, পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, রোগীর সেবা আছে, প্রবন্ধ লেখা আছে, সভাসমিতি করা আছে, বক্তৃতা করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আছে, সংবাদপত্র পড়া আছে, চাকুরী বজায় রাখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য যাহার আছে এইরূপ ব্যক্তি "মৎকর্ম্মপরম" হইতে পারিবে না। এইরূপ ব্যক্তিও তাহার কর্ম্মগুলিকে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস করুক। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বর-প্রীতি জন্য—দাস যে ভাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, সেই ভাবে "তুমি প্রসন্ন হও" স্মরণ রাখিয়া, অহং অভিমান না রাখিয়া, তাহার সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া করুক—ইহাতেও ফলসন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মসন্ন্যাসের অধিকার জন্মিবে; তখন মৎকর্ম্মপরমের উপাসনা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইবে, পরে অভ্যাস যোগ দ্বারা চিত্ত একাগ্র করিয়া সেই সাধক বিশ্বরূপের উপাসনা করিতে পারিবেন; পারিয়া, নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করিয়া উপাসনার চরম ফল যে সর্ব্ব-দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি তাহাই লাভ করিতে পারিবেন।

সমগ্র ধর্ম্মটি এই। যে কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাই করুক না কেন—সমগ্র ধর্ম্মটির কোন না কোন অঙ্গ লইয়া তিনি থাকিবেনই।

যদি কেহ সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, পারসীর ধর্ম্ম ইত্যাদি এই সমগ্র ধর্ম্মেরই অঙ্গ। পূর্ণটি দেখা হয় না বলিয়াই বিরোধ। হিন্দুধর্ম্ম এই জন্য কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন না। পূর্ণ, অংশের নিন্দা করিতে পারেন না কিন্তু অংশগুলি পূর্ণটি না দেখা পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিবেই। কবে জগৎ পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখিবে?

(৬)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি সম্পূর্ণ ধর্ম্মের পাঁচটি অঙ্গ।

(১) নির্গুণ উপাসনা—"আপনি আপনি" ভাবে স্থিতি।

(২) বিশ্বরূপ উপাসনা—আপনিই বিশ্বরূপ ভাবে স্থিতি।

(৩) অভ্যাস-যোগে বিশ্বরূপ—কোন অবলম্বন ধরিয়া তাহাই যে সমস্ত, নিরন্তর এই ভাবনা।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, জগতের যে বস্তুই কেন অবলম্বন করনা, তাহার স্বরূপ-টিতে যাও দেখিবে, সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সেই একই বস্তু ভাসিতেছে। জগৎটা এই বস্তুকে দেখাইয়া দিতেছে বলিয়া সেই এক বস্তুটি যেন এই জগৎ-রূপে সাজিয়াছে, প্রথমে ইহাই মনে হয়। ইহাই বিশ্বরূপে যাওয়া। কিন্তু বিশ্বরূপে গিয়াও আরও চক্ষু প্রসারিত কর দেখিবে, এক সীমাশূন্য "আপনিই আপনি" পদার্থের তিন পাদ পরমশান্ত, সর্ব্ববিধ চলন রহিত। তিনি স্থির সমুদ্রের মত আপন আনন্দে আপনি বিভোর, আপন জ্ঞানে আপনি মগ্ন, আপন ধ্যানে আপনি সমাধিস্থ। অথবা কি ভাবে তিনি আছেন তাহা কে বলিবে? যাঁহাকে বেদও প্রকাশ করিতে পারেন না তাঁহার কথা বলিবে কে? তথাপি যে বলা যায়, তাহা যেমন আকাশের এক স্থান দেখিয়া বলা হয় কি মহান্, কি অনন্ত আকাশ দাঁড়াইয়া আছে! আকাশের দেখিলামত যতটুকু চক্ষে আঁটে, কিন্তু কি মহান্, কি অনন্ত আকাশ! বলিলাম। মনে মনে যেন কত কি দেখিলাম! মনের উপরেও যদি কিছু থাকে তবে যেন ভিতরকার অনন্তে এবং বাহিরকার অনন্তে কি যেন স্তব্ধ চাওয়াচায়ি হইয়া গেল—যেন অনন্ত অনন্তকে স্পর্শ করিল—মন ও বাক্য সেই নিস্তব্ধ অবলোকনকে ভাষা দিয়া বলিতে গেল—বলিল—কি মহান্! কি অনন্ত! বলা কিছুই হইল না, দেখাও কিছুই হইল না—তথাপি বলা হইল মহান্! অনন্ত! অখণ্ড! অপরিসীম!

একটু দেখিয়া, একটু ভাবিয়া, স্তব্ধ হইয়া ভিতরে যাহার আভাস পাওয়া গেল,—ভিতরে যেন কে কাহাকে ছুঁইয়া, ভিতরে যেন আপনাকে আপনি দেখিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার কথা বলিতে গিয়া বলা গেলনা—ভাষা সেখানে পৌঁছিল না। আপনাতে আপনি স্থিতি হয় কিন্তু এ স্থিতির কথা কেহ বলিতে পারেনা—যেমন ভাবেই বল অনন্তকে সীমার মধ্যেই আনা হইয়া যাইবে, যদি কোন কিছু দিয়া তাহা প্রকাশ করিতে চাও।

বলা হইল "আপনিই আপনি" এইটিই তিনি। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরবয়ব, নিরা-

কার—তাঁহাতে কোন গুণ দাও বা অবয়ব দাও বা আকার দাও তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা আছেন সত্য কিন্তু বুঝিলে তাঁহাকে সাকার করিয়া, গুণবান্ করিয়া, অবয়ব যুক্ত করিয়া। বিশ্বরূপের উপাসনা কর—তাহাও যেমন সাকার, অবতার উপাসনা কর তাহাও সেইরূপ সাকার। বিশ্বরূপের উপাসনাতে, বা প্রতিমার মূর্ত্তিতে যে উপাসনা, এই দুই উপাসনাতে একই কার্য্য করিতে হইবে—জড়টি ভুলিয়া চৈতন্যটিকে স্পর্শ করিতে হইবে—তোমার উপাস্য বিশ্বরূপই হউক বা কোন মূর্ত্তিই হউক তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। যাহাকে চিন্তা করিয়া জড়ভাব বিগলিত করিতে পারিবে তাহাই তোমার তিনি—তাহাই "আপনি আপনি"। জড়ের আবরণটা—শক্তির ব্যক্তাবস্থাটা—সেই অখণ্ডকে যা'হোক তা'হোক করিয়া দেখান মাত্র। সেই জন্য বলা হইল, কোন অবলম্বন ধরিয়া বিশ্বরূপে যাইতে হইবে। বিশ্বরূপে পৌঁছিলে—তবে এই অনন্ত কোটি জগৎ-তরঙ্গ যে, সেই পরমপদের সর্ব্ব নিম্ন পাদের এক অতি ক্ষুদ্র স্থানে,—ইহার ধারণা হইবে। এই ধারণা দৃঢ় হইলে পরমপদে স্থিতি হইবে।

ব্রহ্মের তুরীয় পাদটি মাত্র নিরাকার; অন্য পাদত্রয় সাকার। এই সাকার আবার দ্বিবিধ—উপাধিশূন্য সাকার এবং উপাধিযুক্ত সাকার। উপাধিশূন্য সাকার তিন ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মবিদ্যা সাকার, আনন্দ সাকার এবং উভয়াত্মক সাকার। উপাধিযুক্ত সাকারটিকে বলে অবিদ্যা পাদ। এই অবিদ্যা পাদের এক স্থানে এই জগৎ-তরঙ্গ। শ্রুতির চিত্র আমরা দিতেছি।
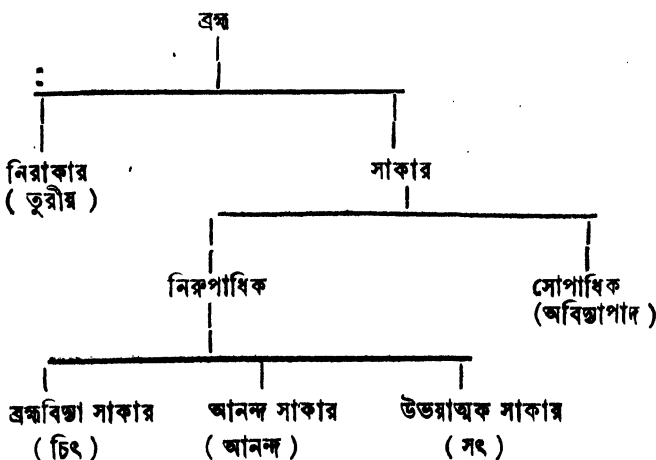
শ্রুতি বলেন—পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম।

কিং তৎপাদচতুষ্টয়ং ভবতি ?

অবিদ্যাপাদঃ প্রথমঃ পাদো বিদ্যাপাদো দ্বিতীয়ঃ

আনন্দপাদস্তৃতীয় স্তুরীয়পাদশ্চতুর্থ ইতি।

তত্রাধস্তনমেকং পাদমবিদ্যাশবলং ভবতি। উপরিতনপাদত্রয়ং শুদ্ধ-বোধা-ঽনন্দলক্ষণমমৃতং ভবতি। তুরীয়ন্তু নিরাকারম্। সাকারঃ সাবয়বো নিরবয়বঃ নিরাকারম্। তস্মাৎ সাকারমনিত্যং নিত্যং নিরাকারমিতি শ্রুতেঃ।

তুরীয় পাদটি মাত্র নিরাকার। এই নিরাকারে স্থিতিই নিরাকারোপাসনা ; তদ্ভিন্ন নিরাকারের অন্য কোন রূপ উপাসনা হয় না।

ব্রহ্মের ঊর্দ্ধ ত্রিপাদ হইতেছে—বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও উভয়াত্মক পাদ—এই তিন পাদ শুদ্ধবোধ-আনন্দ-অমৃতস্বরূপ। এই তিন পাদকেও সাকার বলা হইতেছে। তুরীয় পাদটি নিরাকার।

মাতেব হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতি আপনিই প্রশ্ন করিয়াছেন—

নিরবয়বং ব্রহ্ম চৈতন্যমিতি সর্ব্বোপনিষৎসু সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তেষু শ্রূয়তে। অথচ বিদ্যানন্দ তুরীয়াণামভেদ এব শ্রূয়তে।

ব্রহ্ম চৈতন্য নিরবয়ব। সর্ব্ব-উপনিষদ্ ইহা বলিতেছেন। সর্ব্ব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ইহা। আর বিদ্যাপাদ, আনন্দ পাদ, তুরীয় পাদ এই সকলই ত অভেদ। অভেদ যদি, তবে এই সাকার ভেদ কেন ?

শ্রুতি উত্তরে বলেন—বিদ্যাপ্রাধান্যেন বিদ্যাসাকারঃ আনন্দপ্রাধান্যেনানন্দ-সাকারঃ উভয়প্রাধান্যেনোভয়াত্মকসাকারশ্চেতি। বস্তু বস্তু অভেদ, কেবল প্রাধান্য মাত্রেই ভেদ।

ব্রহ্ম চৈতন্য যেমন নিরাকার, নির্গুণ ; জীব চৈতন্যও সেইরূপ নিরাকার ও নির্গুণ। মহাভারত শত সহস্র স্থানে বলিতেছেন—

"জীব নির্গুণ ও দেহশূন্য। কেবল ভ্রান্তিবুদ্ধিগণ ভ্রমবশতঃ উঁহারে সগুণ ও দেহ যুক্ত বলিয়া গণনা করে।" আবার বলিতেছেন—"ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।" অনুগীতা ৩০ অধ্যায়।

নিরাকার পাদটি মাত্র মায়ালেশশূন্য। অন্য ত্রিপাদ মায়াগুণবিশিষ্ট। মায়া পরিচ্ছন্ন বলিয়াই সাকার সাবয়ব বলা হইল। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম যে ভাবেই কেননা মায়াতে উপহত হয়েন, তিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপেই অবস্থিত। সমুদ্রের এক দেশে তরঙ্গ উঠিলেও ঐ তরঙ্গতাড়িত সমুদ্রাংশের মূলদেশে কিন্তু সেই পরমশান্ত

চলনরহিত ব্রহ্মই আছেন। উপরে তরঙ্গ উঠে, ভাসে, ভাঙ্গে মাত্র। ব্রহ্ম মায়া-কর্ত্তৃক ঈশ্বর ভাবে—বা জীব ভাবে—যেরূপেই কেননা প্রতিবিম্বিত হয়েন, তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বরূপ ঐ তুরীয় অবস্থায় আছেন। অন্য অবস্থাগুলি মায়া দ্বারা কল্পিত মাত্র—মূলে সেই স্বস্বরূপ। এই স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান—বা "আপনিই আপনি" ভাবটিতে লক্ষ্য না রাখিলে শ্রুতি বা গীতা ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ বোধ হইবে।

শ্রুতি বলেন—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" কঠ ২য় বল্লী ২১শ শ্রুতি। আসীন হইয়া দূরে ভ্রমণ করেন, শুইয়া থাকিয়াও সর্ব্বত্র যান।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

এজতি = চলতি, তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে, তিনি নিকটে ; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে।

গীতাও এই নির্গুণ ও সগুণ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই সর্ব্বত্র বলিতেছেন "ন সত্তন্নাসদুচ্যতে" ১৩।১২ ; "নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ" ১৩।১৪ ; "দূরস্থং চান্তিকেচ তৎ" ১৩।১৫ ; "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ১৩।১৬ এক স্থানে বসিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন, শুইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন—এই বাক্যগুলি একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, মায়া-গুণান্বিত, তিনি মায়া গুণে চলেন, স্বরূপে চলেন না ইত্যাদি।

এই তিনটি অঙ্গের পরে আরও দুইটি অঙ্গ বলা হইয়াছে।

(৪) মৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও।

(৫) তোমার কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর।

এই শেষ দুইটি—কর্ম্ম, আর প্রথম তিনটি—উপাসনা। ইহার মধ্যে নির্গুণ উপাসনাটি জ্ঞান। উপাসনা ও ভক্তি এক বল ক্ষতি নাই ; কিন্তু নির্গুণ-উপাসনা বলিলেই বুঝা যায়, যাহাকে উপাসনা বা ভক্তি বল তাহাই জ্ঞান।

বেদে যেমন জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, এই তিনটি প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে গীতাও সেই তিনটিকেই দেখাইতেছেন। কর্ম্মগুলি না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না ; উপাসনা না করিলে চঞ্চল মন ভগবৎ-রসে আপ্লুত হইয়া শান্ত হয় না ; মন ভগবৎ-রসে না ভিজিলে "আপনাতে আপনি" ভাবে স্থিতিলাভ কিছুতেই করিতে পারে না।

কর্ম্ম করিতে গেলেই নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে— যদি এই ভগবৎ-

আজ্ঞা পালন করিতে যাওয়া যায়, তবে কর্ম্ম করিতে গেলেই, উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা করিতে গেলে, অবলম্বন হইতে বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ হইতে আপনাতে আপনি ভাবে স্থিতি হইবেই।

যিনি "আপনাতে আপনি" ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন—তাঁহার জন্য কর্ম্মও আবশ্যক নহে, উপাসনাও আবশ্যক নহে। যিনি বিশ্বরূপ উপাসনা করিতে পারিতেছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তু হউক না কেন, সেই বস্তু সুরূপ হউক বা কুরূপ হউক, মনুষ্য হউক বা পশু হউক, শত্রু হউক বা মিত্র হউক, বিষ্ঠা হউক বা চন্দন হউক, যিনি সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যকে দেখিয়া—সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখেন, ভেদাভেদ কিছুই দেখেন না, জগৎ যাঁহার নিকট সাক্ষী চৈতন্য, তিনি আবার অন্য কি অবলম্বন করিয়া অভ্যাসযোগে সাধনা করিবেন? যিনি বিশ্বরূপে গিয়াছেন, তাঁহার অভ্যাসযোগে প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র সেই বস্তুকে দেখিতে পান না, 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই জ্ঞানে এখনও যিনি পৌঁছিতে পারেন নাই, যিনি সন্ন্যাসী হইয়াও নিজের দেহ রক্ষার জন্য মাংসাদি ভক্ষণরূপ হিংসাবৃত্তি রাখেন, যিনি 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' হইতে পারেন নাই—যাঁহার হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ এখনও যায় নাই, যিনি এখনও অন্যের অপেক্ষা করেন, যিনি ভিতরে বাহিরে এখনও শুচি হন নাই, যিনি এখনও সর্ব্বদা অনলস নহেন, বিশ্রাম এখনও যাঁহার দরকার হয়, সান্ধ্যভ্রমণ এখনও যাঁহার চাই, যিনি পক্ষপাতশূন্য উদাসীন এখনও নহেন, যিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী নহেন, যিনি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে সম এখনও হন নাই, যিনি 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ' এখনও হইতে পারেন নাই, যিনি 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' এখনও নহেন, যিনি এখনও 'অনিকেতঃ' নহেন, তাঁহার জন্য এখনও অভ্যাসযোগ আবশ্যক। মূর্ত্তিপূজাই করুন বা জ্যোতির্ভাবনাই করুন—অথবা বিশ্বাসে যাহাই কেন না অবলম্বন করুন বা কোন গুণের পূজাই করুন, তিনি সাকারোপাসক।

উপাসনাতে উঠিতে হইলে সকলের জন্যই কর্ম্ম আবশ্যক। তবে কি এখানে ইহাই বলা হইল যে, যিনি কর্ম্মমার্গে আছেন তিনি উপাসনা করিবেন না? না, ইহা ভুল।

মৎকর্ম্মপরম হওয়ার অর্থ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার উপাসনা—স্থূলভাবে মন্দির মার্জ্জনা (দেহ-মন্দিরও ধর্ত্তব্য) মালা গাঁথা, আরতি করা ইহা ত

থাকিবেই। আবার কর্ম্মার্পণেও মনে মনে স্মরণরূপ উপাসনা ত আছেই। তবেই হইল কর্ম্ম ও উপাসনা সমকালেই করিতে হইবে—স্থূলে উপাসনা ও সূক্ষ্মে উপাসনা উভয়ই চাই, জীব-সেবাতেও উপাসনা চাই, আবার মানসেও উপাসনা চাই। সমকালে এই গুলি হওয়া আবশ্যক। এই জন্য আর্য্য-জাতি নিত্যকর্ম্মগুলিকে তিন বেলার কার্য্য রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন অধিকারী তাহাকে সেইরূপ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন।

আমরা গীতা হইতে দেখাইতেছি আত্মা নির্গুণ। জীবাত্মাও নির্গুণ। পরমাত্মাও নির্গুণ। আত্মা সর্ব্বথা "আপনিই আপনি" তাঁহার সদৃশ অন্য কোন বস্তু নাই—তিনি অন্য কোন বস্তুতেও মিশ্রিত হন না। মহাভারত ও এই কথা বলিতেছেন। বেদও এই কথা বলিতেছেন। এইটি ধ্রুবসত্য।।

আত্মা নির্গুণ হইলেও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা তাঁহার গুণসঙ্গ হয়; তখন তিনি গুণবান্ মতন হয়েন।

এ কথা সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে নিতান্ত জড় অবস্থা আসিলেও মানুষ বলিতে পারে—এখন তমোগুণ আসিয়াছে—তা আসুক, আমি গুণ নহি—আমি আপনিই আপনি, গুণের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। তবে বহু-কাল হইতে গুণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আমি গুণের বশ হইয়া গিয়াছি। এই গুণবশ্যতা দূর করিবার জন্য আমাকে শক্তির উপাসনা করিতে হই-তেছে। প্রকৃতির হস্ত হইতে, মনের হস্ত হইতে, মুক্তিজন্য আমি কর্ম্ম ও উপাসনা করি।

মনকে রাগ দ্বেষ শূন্য করিবার জন্য আমি জগতের সমস্ত বস্তুর সহিত যে ক্ষণস্থায়িত্বদোষ-জড়িত, তাহাই আলোচনা করি; সমস্তই নশ্বর—ইহা দেখিয়া দেখিয়া আমি সর্ব্ববস্তুতে আস্থাশূন্য হই—আরও প্রথম প্রথম আমি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা দ্বারা রাগ দ্বেষ জয় করিতে চেষ্টা করি। আবার মনের কামনা ত্যাগজন্য উপরোক্ত বহিরঙ্গ সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ প্রণব জপ লইয়া থাকি এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা আমি মনকে বশীভূত করিয়া বিচার দ্বারা প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবনা করিয়া "আপ-নিই আপনি" ভাবে স্থিতিলাভ করিতে চাই। ইহার সহিত মনকে সরস করিবার জন্য উপাসনাও করি।

আমরা পুনঃ পুনঃ গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম আলোচনা করিতেছি—ইহার উদ্দেশ্য জগতে যে ধর্ম্মগুলি চলিতেছে তাহা এই গীতোক্ত ধর্ম্মের কোন্ অঙ্গ

ইহা দেখাইবার জন্য? যদি কেহ আধুনিক কোন ভুলধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন—তাঁহার ভুল কোন্ স্থানে হইতেছে, অথবা সনাতনধর্ম্মের কোন অঙ্গকে যদি কেহ ভুল প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহাতেও তিনি নিজে কিরূপ ভ্রান্তির মধ্যে আছেন—আমাদের ধারণা গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলে উপরোক্ত ভ্রম সংশোধন করা যায়। তবে, যে গীতা সম্বন্ধে পাওয়া যায়—'অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা'—অথবা

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ।

সেই গীতা আমরাই যে ঠিক বুঝিয়াছি, এরূপ মনে করাও বাতুলতা মনে করি। আমরা প্রাণপণ করি বুঝিতে—এবং এইজন্যই বলিতেছি এই বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হইবে ততই, সুধর্ম্মের প্রতি কুধর্ম্মের গাত্রবল অথবা সত্যধর্ম্মের প্রতি অপধর্ম্মের নিন্দা, সকলেরই বোধগম্য হইবে—অন্ততঃ ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে কোন্‌টি সত্যধর্ম্ম কোন্‌টি অপধর্ম্ম বা গাত্রবলের ধর্ম্ম।

এতদ্দ্বারা মন সংশয়শূন্য হইলে তবে ঠিক সাধনা করা যাইবে।

সাকার বাদ, নিরাকার বাদ, অবতার বাদ, পূজাপদ্ধতি, উপস্থিত জগৎ উন্নত হইতেছে কি না, একবার মানুষ হইলে আবার সে পশু হইতে পারে কি না ইত্যাদি মতের ভ্রান্তিগুলির মীমাংসা সহজেই করা যায়, যদি আমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি বুঝিতে পারি।

গীতা অন্ততঃ একটি সম্পূর্ণ ধর্ম্ম দেখাইতেছেন—আমরা যতই ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব ততই ব্যক্তিগত, জাতিগত, এমন কি সমগ্র মানবজাতির ইহাতে বিলক্ষণ উপকার হইবে। এই সমস্ত কারণে আমরা ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছি।

(৭)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মের অঙ্গ বা অবস্থাগুলির আলোচনা করিয়াছি।

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

(১) সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাধকের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণের উদয় হইবে। "ধর্ম্মাঽমৃত পানের গুণ" ইহাই প্রথম আলোচ্য।

(২) সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে আত্মদর্শন হয়, তাহাতে আত্মাকে কোন্ কোন্ ভাবে দর্শন করা যায়?

(৩) যে সাধক আত্মদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক?

(৪) সম্পূর্ণ ধর্ম্মের যে পাঁচটি অবস্থা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কি কি সাধনা করিতে হয়। অর্থাৎ নির্গুণ উপাসকের সাধনা কি? বিশ্বরূপ উপাসকের কোন্ সাধনা? অভ্যাসযোগী কোন্ সাধনা লইয়া থাকেন? কর্ম্মযোগীরই বা সাধনা কিরূপ? সর্ব্বকর্ম্মার্পণ যিনি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কি সাধনা করিতে হইবে?

এই সাধনাগুলি উল্লেখ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম তিনটি প্রশ্নালোচনা এখানে গৌণ। গীতা এই সমস্ত ব্যাপার দেখাইয়াছেন। আমরা তাহা বুঝিয়া গীতার আজ্ঞা পালন করি, সেইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই; ইহাই উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মামৃত পানের গুণ।

নির্গুণোপাসনা, সগুণোপাসনা, অভ্যাসযোগে সগুণ বিশ্বরূপ, মৎকর্ম্ম পরম সাধনা ও (দাসভাবে) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ সাধনা—এই পঞ্চাঙ্গ তপস্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রম অনুসারে উপাসনা করিলে যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম অমৃতস্বরূপ। গীতা ইহাকে ধর্ম্মামৃত বলিতেছেন। এই অমৃতময় ধর্ম্মসুধা পান করিলে, সকল জ্বালা, সকল তাপ চিরতরে শান্ত হয়।

এই ধর্ম্মামৃত পান করিলে যে গুণরাশি মানুষকে অলঙ্কৃত করে, গীতা বহু স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

মনুষ্যজাতির যে কেহ এই ধর্ম্মামৃত পান করিবেন, তিনি কোন ভূতের প্রতি দ্বেষ করিতে পারিবেন না। সর্ব্বজীবে আত্মভাবে ব্যবহার হইয়া যাইবে। আপনাকে পীড়া দিতে যেমন কেহই চায় না, কেননা আমাদের আত্মাই যে আমাদের অতীব প্রিয়—সেই আত্মদেবই যে আমাদের ঈপ্সিততম, তিনিই যে আমাদের দেবতা, আমাদের দয়িত, আমাদের রমণীয়দর্শন—তাঁহার পীড়া, আত্মদেবের যাতনা যেমন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে প্রস্তুত নহি,—সেইরূপ সর্ব্ব-প্রাণীর দেহ, সর্ব্ব জীবের দেহসমষ্টিরূপ এই ইন্দ্রিয়গোচর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই

আমার হৃদয়ের রাজার, আমার ঈপ্সিততমের, আমার দয়িতের, আমার দেবতার, আমার একমাত্র রমণীয়-দর্শন আত্মদেবের মন্দির, আমি ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিতে পারি না; কোন জীবহিংসা করিলে, কোন প্রাণিদেহকে ক্লেশ দিলে, পাছে সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অসন্তোষ উৎপন্ন হয়—বুদ্ধিপূর্ব্বক আপনার অসন্তোষ যেমন করা যায় না—সেইরূপ কোন জীবকে ব্যথা বা ক্লেশও দেওয়া যায় না।

যিনি এই ধর্ম্মামৃত পান করিয়াছেন, অন্যে তাঁহাকে হিংসা করিলেও তিনি প্রারব্ধক্ষয় হইতেছে ভাবিয়া সেই আত্মদেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সেই হৃদয়ের রাজাকে স্মরণ করিয়া করিয়া সমস্তই সহ্য করিতে পারেন। লয় বিক্ষেপ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, তিরস্কার পুরস্কার, নিন্দা স্তুতি, দেহের পীড়া, দেহের স্বাস্থ্য—সমস্তই তিনি সহ্য করিতে পারেন।

লোকে যাঁহাকে উত্তম বলে, তাঁহাকে তিনি হিংসা করেন না; লোকে যাঁহাকে তাঁহার সমান বলে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মিত্রতা হয়; লোকে যাহাকে অধম বলে তাহাকে অজ্ঞান দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার করুণা হয়। কোথাও অহংকার তাঁহার নাই, কারণ তাঁহার অহংতা প্রসারিত হইয়া সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত, সর্ব্বানুস্যূত শ্রীচৈতন্যে মিশিয়াছে; কোথাও তাঁহার মমতা নাই, কারণ তাঁহার মমতা প্রসারিত হইয়া সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিয়াছে—হায়! জগৎ কবে এই ধর্ম্মামৃত পান করিবে? গীতা আরও বহুগুণের উল্লেখ করিতেছেন। সদা সন্তোষ, অপ্রমত্ত, সংযত-স্বভাব, স্থিতপ্রজ্ঞ, মদ্ভক্ত, যিনি কাহারও পীড়ার কারণ নহেন, তাঁহাকেও কেহ পীড়া দেয় না ইত্যাদি। আমরা বলিতেছি, এই সম্পূর্ণ ধর্ম্মটির পূর্ণভাবে পালন না করা পর্য্যন্ত মানুষের ক্ষুদ্রত্ব থাকিবেই। আমার ধর্ম্মটি ভাল আর সকলের ধর্ম্ম মন্দ, আমার ধর্ম্মটি আশ্রয় না করিলে জীব পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, আমার ধর্ম্ম ভিন্ন পবিত্রতা কোথাও নাই, অন্য ধর্ম্মের বহুদোষ ইত্যাদি কদর্য্য ব্যবহারে জগতের শান্তি কিছুতেই থাকিতে পারিবে না।

শ্রীগীতা দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ২০শ শ্লোকে এই ধর্ম্মামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত।

(৮)

কোন্ কোন্ ভাবে আত্মদর্শন হয়।

যাঁহারা আত্মদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে আত্মার আদি নাই;

তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; তিনি সর্ব্বত্র পাণি-পাদ-অক্ষি-শিরো-মুখ বিশিষ্ট; তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত. কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গুণে প্রতিবিম্বিত; কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তিনি সকলের আধার; সত্ত্বরজস্তম কোনও গুণ তাঁহাতে নাই, অথচ তিনি গুণের পালক; সর্ব্বজীবের বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি; স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি; অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; দূরেও তিনি, নিকটেও তিনি, তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত মত; তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা; তিনি সূর্য্যাদিরও প্রকাশক; তিনি প্রকৃতিরও অতীত; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য; তিনিই সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত।

আত্মার পূর্ব্বলিখিত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই আত্মা যে নির্গুণ হইয়াও সগুণ ইহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা আত্মদর্শনেচ্ছুর যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক তন্মধ্যে দেখাইব আত্মদর্শনেচ্ছু সর্ব্বদা বেদান্তার্থ আলোচনা করিবেন।

উপনিষদ্‌গুলিকেই বেদান্ত বলে।

তিলেষু তৈলবদ্‌বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

তিলে যেরূপ তৈল থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদান্ত বা উপনিষদ্ প্রতিষ্ঠিত।

গীতা যেরূপ ভাবে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের কথা একসঙ্গে বলিতেছেন, উপনিষদ্‌ও সেইরূপ ভাবে বলিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, হিন্দুশাস্ত্র হেঁয়ালীতে পূর্ণ ইহাও বলিয়া থাকেন। যাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহা হেঁয়ালীই বটে!

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" কঠ ২য় বল্লী, ২১শ শ্রুতি।

ব্রহ্ম বসিয়া থাকিয়াও দূরে বেড়াইতেছেন; আত্মা শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন। শুনিতে অসম্ভব মত, কিন্তু কথাটা ঠিক। সকলেই বুঝিতে পারেন মানুষের দেহটি ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু মনটি অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেও পারে। মনের শক্তিই যদি এইরূপ, তবে আত্মার শক্তি কতদূর? শ্রুতি আরও বলেন।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।" ঈশ ৭।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে। শ্রুতির এই সমস্ত উক্তি—যিনি স্বরূপে নির্গুণ,

তিনি স্বস্বরূপে থাকিয়াও যে স্বগুণ ভাব অবলম্বনে গুণবান ও ক্রিয়াশীল হয়েন, তাহাই দেখাইবার জন্য। সাধনার কথা অলোচনাকালে আমরা ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইব।

আত্মার এই সমস্ত ভাবের কথা, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে।

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।"

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ" ইত্যাদি।

আমরা আজ কাল দেখি, সকলেই বলেন সত্য অনুসন্ধান কর। ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানই সর্ব্ব প্রধান সত্যানুসন্ধান। যে ধর্ম্ম ব্রহ্ম চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, জীব চৈতন্য সম্বন্ধে সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না, সেই ধর্ম্ম ঈশ্বরকে বিশ্বাসের বস্তু মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া নীতি লইয়াই থাকে। ঈশ্বরের নাম করিয়া, নীতি অবলম্বনে মানুষকে উন্নত করিবার চেষ্টাই এই সমস্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মে ব্যাবহারিক জীবন উত্থান পতনের স্পন্দনে স্পন্দিত হইলেও, এই ধর্ম্ম শান্তি দিতে পারে না। যতক্ষণ না জীব ও ঈশ্বরকে জানা যায়, যতক্ষণ না জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিজ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই দুঃখের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্র এই জন্য জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বাসের ধর্ম্ম মানুষকে জ্ঞানপথে চালিত করিবার সর্ব্বনিম্ন ভূমিকা। এই সর্ব্বনিম্ন ভূমিকাতে আটকাইয়া থাকিলে, জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। যাঁহারা বলেন, আমরা বিশ্বাস করিয়াই থাকিব, বাকী যাহা তাহা ঈশ্বর করিয়া দিবেন—তাঁহাদের ইহাও বিবেচনা করা উচিত—ঈশ্বর যাঁহাদের বাকাটুকু করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারাই বলিতেছেন, ঈশ্বরকে জানা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ-যান্তি তে" তোমাকে আমি সেই বুদ্ধি প্রদান করিব, যাহাতে তুমি আমাকে পাইবে। বুদ্ধির কার্য্যই বিচার। শ্রীভগবান্ জীবকে বিচার দিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার অনুগ্রহ। হাত ধরিয়া কাহাকেও ভব সংসার পার করিয়া দেন না। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যাহা পরে পাইবে তাহা পূর্ব্বে জানিয়া, ঐ উচ্চাবস্থায় যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে। সেই জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সকলেরই স্বাভাবিক। শুধু বিশ্বাস লইয়া চলিলে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। কাজেই মানুষের সুখ কিছুতেই হইতে পারে না। যে গুলি বিশ্বাসের ধর্ম্ম, সে গুলিও ঠিক বিশ্বাস লইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরকে জানিতে যাইও না—এ

উক্তি তবে নিতান্ত অস্বাভাবিক। এখানে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাহা জানিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে জানাই আবশ্যক। যতক্ষণ না সত্যে উপনীত হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে। যে ধর্ম্মে বিচারের অনাদর, সে ধর্ম্ম যথার্থ-সাধককে আপনার ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে না।

আমরা এই কারণে বেদ প্রমুখ শাস্ত্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইতে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে অতি সংক্ষেপে সেই মীমাংসা উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আত্মা ইত্যাদি শব্দে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ চৈতন্যকেই লক্ষ্য করা হয়। উপাধি জন্যই আত্মার বহু নাম। "স্ফটিকে নানাবিধ বর্ণের পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইলে উহা যে প্রকার নানারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাও সেইরূপ মায়াদ্বারা বিবিধ নামরূপে পরিচ্ছিন্ন (মত) হইয়া বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এক ব্যক্তিই ক্রিয়া ও কর্ম্মভেদে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েন, মহৈশ্বর্য্য পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ নামরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর নৃত্য-বিমোহিত চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য করে—মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। অর্য্য শাস্ত্রপ্রদীপ।

উপনিষদাদিতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সম্বন্ধে মীমাংসা-বাক্য এইরূপ :—

যে আত্মদর্শন দ্বারা জরামৃত্যু পুনর্জ্জন্মাদি দূর করিতে পারা যায়—সেই আত্মা আপন স্বরূপে আপনিই আপনি। আত্মার স্বস্বরূপটি নির্গুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে যখন মণির ঝলকের মত মায়ার উদ্ভব হয়, তখন সেই ব্রহ্ম স্বস্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়ার সঙ্গ করেন। মায়া যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত, তবে মায়ার সহিত আত্মার সঙ্গ হয়—ইহা বলা যাইত না। ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর সঙ্গ কি? যাহা হউক মায়ার সঙ্গ হইলে আত্মার নাম হয় পুরুষ, সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ইত্যাদি।

আর মায়ার নাম হয় অব্যক্ত, প্রধান, প্রকৃতি, সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা ইত্যাদি প্রকৃতির গুণে ভগবান্ মত হইয়া পুরুষ কিরূপ হয়েন, গীতা তাহা ১৩।২১ শ্লোকে বলিতেছেন। বলিতেছেন, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়াও এবং প্রকৃতির পরিণাম যে এই দেহ—এই দেহে অধিষ্ঠান করিয়াও সেই পুরুষ উপদ্রষ্টা, সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমেশ্বর।

জীব সর্ব্বদা স্মরণ রাখুক, জীবের দেহে এই পুরুষ আছেন। এই পুরুষই

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করেন। যখন প্রকৃতি তাঁহাকে নানান্ ভোগ করাইয়াও কিছুতেই স্ববশে আনিতে পারেন না, তখন তিনি ঈশ্বর। যখন প্রকৃতির গুণসঙ্গে তিনি বদ্ধ হন, মুগ্ধ হন, "আমি, আমার', ইহাতে জড়িত হন, তখনই তাঁহার জীবত্ব ঘটে এবং সদসৎ যোনিতে তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। প্রকৃতি জড়। ১৩।২০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তিনি কার্য্যকারণ-রূপে পরিণত হন—পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ। কিন্তু সুখ দুঃখ, শোকমোহাদি ধর্ম্মে জড়িত পুরুষ বা জীবাত্মা—ইহা প্রকৃতিসঙ্গ বশতঃই তাঁহার হয়। প্রকৃতির ধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপ হয় মাত্র। এই যে প্রকৃতি—তাঁহার বিকার ও তাঁহার গুণ এবং তৎসঙ্গে জড়িত পুরুষ - ইঁহারা উভয়েই অনাদি (১৩।১৯)। মণির ঝলকের মত মায়া, ব্রহ্ম হইতে উঠেন—উঠিলেই ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি সাজেন। ইহা অনাদিকাল হইতেই হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি হইলেও অনন্ত নহেন। কেননা ব্রহ্ম যখন স্বস্বরূপে আপনিই আপনি ভাবে অবস্থান করেন, তখন প্রকৃতি পুরুষ থাকেন না, মায়াও থাকেন না। সমস্ত স্পন্দন, সমস্ত স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্পশক্তিরূপা মায়া, তখন পরমশান্ত চলনরহিত শক্তিমান্ স্পর্শে তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া যান। এই অবস্থায় মায়া আছেন বা নাই কিছুই বলা যায় না। তিনি অনির্ব্বচনীয়া। সেই জন্য বলা হইল, অনাদি হইলেও ইহাদের অন্ত আছে।

প্রকৃতি ও পুরুষই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ; অপরা ও পরা প্রকৃতি। যাঁহার এই দুই প্রকৃতি তিনিই আত্মা, তিনিই নির্গুণ, তিনিই আপনি আপনি।

আত্মদর্শনেচ্ছু কোন্ কোন্ ভাবে আত্মাকে দর্শন করেন? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই আবার বলা হইল।

আত্মদর্শনেচ্ছু আত্মাকে দেখিবেন (১) তিনি অনাদিমৎ (২) তিনি সৎ ও নহেন, অসৎও নহেন (৩) তিনি সর্ব্বত্র পাণি-পাদ-অক্ষি-শিরোমুখ-বিশিষ্ট (৪) সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গুণে প্রতিবিম্বিত (৫) কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তিনি সকলের আধার (৬) সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণ তাঁহাতে নাই, অথচ তিনি গুণের পালক (৭) সর্ব্ব জীবের বাহিরে অন্তরে তিনি (৮) স্থাবর জঙ্গম তিনি (৯) অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় (১০) দূরে ও নিকটে তিনি (১১) তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তমত (১২) তিনি সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা (১৩) তিনি সূর্য্যাদিরও প্রকাশক (১৪) তিনি প্রকৃতিরও অতীত (১৫) তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য (১৬) তিনি সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত।

সাধক সর্ব্বদা আত্মার আপনিই আপনি বা নির্গুণ ভাব ও সগুণ ভাব ধরিয়া আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ ভাবে দেখিবার নাম আত্ম-দর্শন।

(৯)

প্রকৃত ধার্ম্মিকের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক ?

শ্রীগীতা বলিতেছেন—যিনি ব্রহ্মকে জানিতে চাহেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে চাহেন, তাঁহার নিম্নলিখিত ২০টী গুণ থাকা আবশ্যক। এই গুণগুলি উপার্জ্জন করিতে যিনি পারেন নাই, অথবা উপার্জ্জনে যাঁহার চেষ্টা নাই, অথবা চেষ্টা করিলেও যিনি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায় না। ঐরূপ সাধক অশুদ্ধচিত্ত। চিত্ত যতদিন অশুদ্ধ থাকে, ততদিন সগুণ উপাসনা এবং মূর্ত্তি-অবলম্বনে বিশ্বরূপের উপাসনাতেও তাঁহার অধিকার জন্মায় নাই। তিনি বিশ্বাসের ধর্ম্মে থাকিয়া কর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন অবস্থা যে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ: তাহাই অভ্যাস করিবেন। একথা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

এই ২০টী গুণকে জ্ঞানের সাধনও বলে।

(১) মানত্যাগ। লোকের নিকট কোন প্রকার সম্মান প্রার্থনা না করা।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ ভাবিতে হইবে; পদদলিত করিয়া গেলেও, ঈশ্বরই অন্যরূপে চরণধূলি দিয়াছেন মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্যে পীড়ন করিলেও, তরুর মত সহিষ্ণু হইতে হইবে; বৃক্ষ যেমন প্রহারকারীকে আপনার সর্ব্বস্ব যে ফল ফুল ও ছায়া তাহাই দান করে, সেইরূপ সাধকও উৎপীড়নকারীকে হাসিতে হাসিতে যথাসর্ব্বস্ব দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নিজে সম্মান আকাঙ্ক্ষা না করিয়া অন্য সকলকে মান্যপ্রদান করা এইরূপ সাধকের কর্ত্তব্য।

গুণ থাক্ বা না থাক্ আমি গুণবান্ এই বোধে যে আত্মশ্লাঘা, সেই আত্ম-শ্লাঘা জন্য মানুষ লোকের কাছে সম্মান চায়। আত্মশ্লাঘা না থাকাই অমানিত্ব। সবই তুমি এই দেখিতে যিনি চান, তিনি তোমার সর্ব্বরূপের কাছে আপনাকে আপনি অণুজ্ঞান করিয়াই থাকেন।

(২) **দম্ভত্যাগ—আমি ধার্ম্মিক, আমি বিদ্বান্, অন্যে আর বুঝিবে কি;**

কেহই উদারচেতা নহে, কারণ আমার উদারধর্ম্ম সে গ্রহণ করে নাই—এই সমস্ত অভিমানই দম্ভ। এই দম্ভসহকারে ধর্ম্মপ্রচারই দাম্ভিকতা। আত্ম-দর্শনেচ্ছুর এই দম্ভ ত্যাগ করা চাই।

(৩) অহিংসা—বাক্য, মন ও কায় দ্বারা পরপীড়া বর্জ্জন। অন্যকে উপদেশ দিতে গেলেও ভালবাসিয়া উপদেশ দেওয়া চাই, পীড়া দিয়া বা হিংসা করিয়া উপদেশে কোন কার্য্য হয় না। শ্রীভগবানের ভাব যাঁহার আসিয়াছে, তিনি বাক্য মন ও শরীর দ্বারা কোন প্রাণীর মৎস্য, পক্ষী, ছাগ, কুক্কুট এমন কি অণ্ডস্থিত হংসেরও পীড়া দিতে পারিবেন না। নিজের জীবনরক্ষার জন্য অন্যের প্রাণবিনাশ না করিয়া আত্মজ্ঞানেচ্ছু নিজের জীবন দিয়াও অন্যের প্রাণরক্ষা করিবেন। এইরূপ করিলে, তবে সর্ব্বপ্রাণীর যিনি ঈশ্বর তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে তিনি পড়িবেন।

(৪) ক্ষান্তি—পরকে পীড়া ত দিবেনই না, কিন্তু অকাতরে তিনি পরপীড়ন সহ্য করিবেন।

(৫) আর্জ্জব—ঋজু বা সরল হওয়া। মনে মনে ঘৃণা আর মুখে আপ্যায়িত করা ইহা কুটিলতা। কুটিলতা ত্যাগই আর্জ্জব-সাধনা। সমস্তই ঈশ্বর—এই ধারণা যাঁহার হইয়াছে, তিনি কুটিল হইবেন কাহার নিকট?

(৬) আচার্য্যোপাসনা—আত্মজ্ঞ গুরুর উপাসনা সেবা ইত্যাদি।

(৭) শৌচ—মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বারা বাহ্যশুচি এবং সুখীর প্রতি মিত্রভাব, দুঃখীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি হর্ষভাব এবং কুৎসিত কর্ম্ম-কারীর প্রতি উপেক্ষা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা অন্তঃশুচি হওয়া।

(৮) স্থৈর্য্য—শত বাধা প্রাপ্ত হইলেও, ঈশ্বরলাভের সাধনা ত্যাগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ তল্লাভে চেষ্টা।

(৯) আত্মনিগ্রহ—মন, বাক্য ও কায় দণ্ড গ্রহণ। আত্মা শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে যাহার ব্যাপক সে তাহার আত্মা। মন বাক্য ও শরীরকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিয়া, উহাদিগকে সন্মার্গে নিরোধ করাই আত্মনিগ্রহ বা আত্মসংযম।

(১০) বিষয়বৈরাগ্য—বিষয়সুখ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণধ্বংসী: এই ভাবে বিষয়-দোষ দর্শন করিয়া বিষয়ভোগেও ভিতরে অরুচি আনয়ন করা।

(১১) অনহঙ্কার—দেহাদিতে অভিমান করিয়া আমি উৎকৃষ্ট এই অভিমান না করা।

(১২) দোষদর্শন—জন্মমৃত্যু জরা প্রভৃতি দোষের বারংবার আলোচনা করা।

(১৩) (১৪) অসক্তি } —স্ত্রী পুত্র দেহাদিতে ভিতরে আমি আমার ত্যাগ
অনভিষঙ্গ } করিয়া বাহিরে একটা মৌখিক কর্তৃত্ব।

(১৫) সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব—ইষ্টই আসুক বা অনিষ্টই আসুক, সর্ব্বদা হর্ষ-বিষাদশূন্যত্ব।

(১৬) অনন্যযোগে ভক্তি—পরমেশ্বর ভিন্ন আমার গতি নাই এই নিশ্চিত বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে ভজনা করা।

(১৭) বিবিক্ত দেশ সেবা - ভয়বর্জ্জিত, বিঘ্নবর্জ্জিত, চিত্তপ্রসাদকর অরণ্য, নদীতট বা দেবগৃহে একা থাকিতে ভালবাসা।

(১৮) প্রাকৃত লোকসঙ্গ ত্যাগ—পামর ও বিষয়ীর সঙ্গ না করা।

(১৯) আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা—আত্মজ্ঞানলাভে সদা উদ্যোগ। অবিদ্যাপাদ, বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও তুরীয়পাদের কথা শ্রবণ করিয়া, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদর্শনচেষ্টা।

(২০) তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, বেদান্তের অর্থ আলোচনা—এইগুলি যিনি উপার্জ্জন করিবেন, তাঁহাকে নিষিধ্য ত্যাগ, বিহিত গ্রহণ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের সাধনা করিতে হইবে।

আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে যিনি ইচ্ছুক, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থিতি যাঁহার লক্ষ্য, তিনি উপরোক্ত ২০টী জ্ঞানসাধন করিবেন।

(৪)

গীতার পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ জন্য সাধনা।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি সাধনাটিই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়। বিষয়টি জানিয়া যদি লাভ করিতে চেষ্টা না করিলাম, তবে জানা বৃথা। ধর্ম্মামৃত পান করিলে সকল শোক দূর হয় জানিলাম, সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয় বুঝিলাম, কিন্তু ঐ অমৃত পান করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম না; সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার ঈপ্সিততমকে, দয়িতকে, রমণীয়-দর্শনকে অপূর্ব্বভাবে দর্শন করা যায় শুনিলাম—শুনিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণ-পণ করিলাম না; যে যে গুণ উপার্জ্জন করিলে তাঁহাকে পাই, তাঁহাতে চিরস্থিতি লাভ করিতে পারি, তাহা জানিয়াও রজস্তমঃ নিবৃত্তি করিয়া নিত্য-সত্ত্বস্থ হইতে চেষ্টা করিলাম না—নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি-

লাভ করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলাম না—ইহারই নাম প্রকৃত আত্মহত্যা; সাধনা না করিয়া ব্যভিচারিহৃদয় লইয়া থাকাই আত্মবধ নাটকের অভিনয় করা। নির্জ্জনে একান্তে আছি, কিন্তু অন্তরে কি এক যাতনা অনুভব করি; কেহ প্রহার করিতেছে না, কেহ তিরস্কার করিতেছে না, তথাপি প্রাণে একটা যাতনা অনুভব করিতেছি; এ যাতনা কোথা হইতে আইসে? আমাদের প্রিয় যাহা তাহার বিনাশ যখন হয়, তখনই মর্ম্মান্তিক যাতনা হয়। বাহিরে কোন ক্লেশের কারণ নাই—তথাপি যাতনা যখন পাই, তখন বুঝিতে হইবে আমি আত্মহত্যা করিতেছি। রমণীয়দর্শনকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া যখন অসুন্দরকে সুন্দর মনে করিয়া তাহার পানে ধাবিত হই, তখনও আত্মবধ নাটকের অভিনয় হয়। সাধনা না করাই আত্মহত্যা।

শরীর, মন ও বাক্যকে ছন্দোমত স্পন্দমত করিতে চেষ্টা না করিয়া, অন্য বিষয়ে চেষ্টা করাকে উন্মত্ত চেষ্টা বলে। উন্মত্ত চেষ্টা যেখানে হয়, সেখানেও আত্মবধ হয়। আত্মহত্যা নিবারণের জন্যই গীতোক্ত এই সাধনাগুলি আমাদিগের করা উচিত। শ্রীগীতা সেই জন্যই পূর্ণধর্ম্মের সাধনা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পঞ্চাঙ্গ ধর্ম্মের সাধনার কথা আলোচনা করিব।

শ্রীগীতা দুইটি মাত্র শ্লোকে সমস্ত সাধনাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোক দুইটি এই:—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

কেহ কেহ ধ্যানযোগে আত্মা দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করেন। অন্যে সাংখ্যযোগে, অপরে কর্ম্মযোগে ঐরূপে দর্শন করেন।

আবার অন্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে না জানিয়া, আচার্য্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও শ্রবণপরায়ণ হয়েন বলিয়া—মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও বিশ্বাসযোগ এই চারিটি সাধনা দ্বারা ধর্ম্মামৃত পান করা যায়, অপূর্ব্বভাবে আত্মদর্শন করা যায়। আত্মদর্শনে যে যে গুণের উদয় হয়, সেই সমস্ত গুণগুলিও আপনা হইতে এই সাধনার ফলে লাভ করা যায়।

গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম্মের যে পাঁচটি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিরই শেষ লক্ষ্য আত্মদর্শন।

আত্মদর্শন যে হইবে তাহাতে দর্শন করিবে কে? দর্শন হইবেই বা কোথায়?

আত্মাই ত দ্রষ্টা। দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে কে? দ্রষ্টা আপনাকে দর্শন করিবেন—কোথায় করিবেন?

শ্রীগীতা বলিতেছেন আত্মাকে আত্মদ্বারা আত্মাতে দর্শন করিতে হইবে। তিনবার আত্মাশব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহারা কি এক অর্থেই ব্যবহৃত? প্রথমে ইহার আলোচনা হউক।

শাস্ত্র আত্মা শব্দকে বহু অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যে যাহার ব্যাপক, সে তাহার আত্মা।

আত্মাকে আত্মদ্বারা আত্মাতে দর্শন করার অর্থ—আত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধিতে দর্শন করিতে হয়। ন।

আমরা এক্ষণে পঞ্চাঙ্গ ধর্ম্মের সহিত এই চারিপ্রকার সাধনার স র্ক দেখাইতেছি।

(১) নির্গুণ উপাসকের জন্য ধ্যানযোগ।

(২) সগুণ বিশ্বরূপ উপাসকের জন্য জ্ঞানযোগ।

(৩) অভ্যাস যোগীর জন্য অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগ।

(৪) মৎকর্ম্মপরমের জন্য বহিরঙ্গ কর্ম্মযোগ।

(৫) সর্ব্ব কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণকারীর জন্য বিশ্বাসযোগ।

আমরা নিম্নসাধনা হইতে উচ্চসাধনাগুলির আলোচনা করিতেছি। ন

বিশ্বাস যোগ। তুমি সর্ব্বত্র আছ। জড় আকাশ যেমন সর্ব্ব বস্তুর ভিতরে বাহিরে আছে, তুমি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সকলের ভিতরে বাহিরে অ জড় জড়ের মত থাকে, তুমি চৈতন্যরূপে আছ। যখন আপনস্বরূপে আপ— আপনি তুমি, তখন সৃষ্টি নাই। যখন মায়াময় তুমি, তখন তুমি সকলের নিয়ন্ত্র রূপে আছ। জড় কিন্তু তোমাকে জানে না, জানিতে পারেও না জড়ের মধ্যে, এমন কিছুই নাই, যাহা তোমাকে জানিতে পারে। তোমার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই তোমাকে জানিতে পারে। সে শক্তি তুমিই মানুষকে দিয়াছ। এই জন্য মানুষ, সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তোমাকে জানিবার প্রথম কৌশল হইতেছে তুমি আছ এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস লইয়া সাধনা করিতে হইবে,

তবে তোমাকে ক্রমে ক্রমে জানা যাইবে। বিশ্বাসীর সাধনা কর্ম্ম। কর্ম্ম কিন্তু যেমন তেমন করিয়া করিলে হইবে না। কর্ম্ম করিতে হইবে—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া নহে। ফলাকাঙ্ক্ষার অর্থ সুখলাভ বা দুঃখনাশের জন্য কর্ম্ম করা। সাধারণ মনুষ্য সুখলাভ বা দুঃখনাশের জন্যই কর্ম্ম করে। সাধক কোন কর্ম্ম সুখ বা দুঃখের প্রাপ্তি বা বিনাশের জন্য করিবেন না। তিনি তোমাকে বিশ্বাস করেন বলিয়া তুমি প্রসন্ন হও এইটি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিবেন। তুমি প্রসন্ন হও এইটি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্ম্মে সুখ বা দুঃখ যাহা আসুক, তাহা তাঁহার গৌণ। বরং তিনি সুখ ও দুঃখকে অগ্রাহ্য করিবেন। সুখ ও দুঃখকে সহ্য করিয়া কর্ম্ম করিবেন। এমন কি, তোমার আজ্ঞাপালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে তিনি কাতর হইবেন না। সুখ বা দুঃখ সহ্য করার কৌশল হইতেছে এই। সুখ দুঃখ যাহা আইসে, তাহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল মাত্র। যাহা করা হইয়াছে তাহার ফলভোগ হইবেই; কিন্তু তাহাতে সাধকের বিচলিত হইবার কিছুই নাই; অসন্তুষ্ট হইবারও কিছুই নাই। সাধক যে অবস্থাতেই পড়ুন না কেন, তিনি কখন অসন্তুষ্ট নহেন। সুখ দুঃখ যাহা আসিতেছে, তাহাতে তাঁহার প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যাইতেছে;—তুমিই তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া দিতেছ—সাধক এইটি মনে রাখিয়া আর তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তোমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া, সুখ বা দুঃখের অবস্থা কাটাইয়া যাইবেন। সকলের মধ্যে তুমি আছ এইটি স্মরণ করিয়া সকল অপমান, সকল তাড়না সহ্য করিবেন। সকল অবস্থাতে তোমাকে স্মরণ করাই তাঁহার আত্মরক্ষা। নিত্যকর্ম্মে কখন তাঁহার অবহেলা বা আলস্য হইবে না। সংসারকর্ম্মেও তাঁহার কোন প্রকার কাতরোক্তি থাকিবে না। পাপ করিতে তিনি পারেন না, কারণ পাপ করিতে তুমি আজ্ঞা কর নাই। তিনি সকলের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, কারণ ধর্ম্মরূপে তুমিই সকলের মধ্যে; কিন্তু পাপের সেবা করিতে তিনি পারেন না, পাপীকে বিনাশও তিনি করেন না; কারণ বিনাশভার তুমি তাঁহাকে দাও নাই। বিশ্বাসী কর্ম্ম দ্বারা তোমার প্রসন্নতা লক্ষ্য করিবেন, ইহাই বিশ্বাসীর সাধনা।

কর্ম্মীর বহিরঙ্গ সাধনা—যাহাদের সকল প্রকার কর্ত্তব্য বোধ আছে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির উপর কর্ত্তব্য আছে, তাহারাও ঐ সমস্ত কর্ম্ম করিবে তোমার প্রীতি জন্য। বিশ্বাসী যাহা যাহা করেন, কর্ম্মী তাহার উপরেও বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কর্ম্ম করিবেন। কর্ম্মযোগী যিনি—তিনি যম,

নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার পর্য্যন্ত অভ্যাস করেন। সংসারের কর্ত্তব্য তোমার প্রীতির জন্য করেন, আবার উপরোক্ত কর্ম্মগুলিও তোমার প্রীতির জন্য করেন। আর নিম্নশ্রেণীর ভক্তগণ বাহ্যপূজা, মন্দিরমার্জ্জন, ধূপ দীপাদি দান, নাম জপাদি ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম দ্বারা ক্রমে উন্নত অবস্থা লাভ করিবেন।

কর্ম্মীর অন্তরঙ্গ সাধনা—তুমি বলিতেছ মৎকর্ম্মপরম হওয়াই এইরূপ সাধকের কার্য্য। ইঁহাদের আর অন্য কর্ত্তব্য নাই। এক কর্ত্তব্য, তোমার কর্ম্ম করা। এই কর্ম্ম যোগী ও ভক্তের পক্ষে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস। ভক্ত মানসপূজার অভ্যাস করেন, যোগী আত্মসংস্থ হইবার জন্য যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা করেন। ইঁহারা বিশেষরূপে ধারণাভ্যাসী। ইঁহারা ক্রমমুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করেন। ইঁহারা কোন একটি অবলম্বনে, তোমার ভাব আরোপ করিয়া নিজের হৃদয়ে তাঁহাকে দেখেন; সর্ব্ব বস্তুতেও সেই উপাস্য আছেন স্মরণ করে। সেই উপাস্যের সহিত সর্ব্বদা থাকা, সর্ব্বদা কথা কওয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করা এই অবস্থার কার্য্য। অন্য কর্ত্তব্য ইঁহাদের নাই। ইঁহারাই অভ্যাসযোগী। অভ্যাসযোগী উপাস্য অবলম্বনে বিশ্বরূপে পৌঁছিবেন। ইহাই অভ্যাসযোগীর অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগ।

সগুণ উপাসকের জন্য জ্ঞানযোগ ও নির্গুণ উপাসকের জন্য ধ্যানযোগ।—এই দুই প্রকার সাধকের অবস্থা প্রায় একরূপ। একটি সাধনা সম্পন্ন হইলে অন্যটি আসিবেই।

যখন কর্ম্মদ্বারা চিত্ত হইতে রাগদ্বেষ দূর হয়, যখন উপাসনা দ্বারা চিত্ত আপন উপাস্যে একাগ্র হইয়া ভগবৎরসে পূর্ণ হইতে থাকে, তখন একান্তে গমন করিয়া জ্ঞানসাধনার সময় আইসে।

এই অবস্থায় সাধক প্রাতে শুভক্ষণে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি শেষ করেন,—করিয়া বাহিরে প্রবাহিত শক্তিগুলিকে কুম্ভক বা মানস পূজাদি ব্যাপারে ভিতরের প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করেন—কার্য্য করে প্রকৃতি। যতদিন কর্ম্ম আছে, ততদিন প্রকৃতিই তাহা করিতেছেন। আত্মা কিন্তু প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানাই জ্ঞান। অন্য সমস্তই অজ্ঞান। এই জ্ঞান, যোগসাধনা হইলেই নির্গুণ উপাসনার আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভের সময় আইসে। আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—এই বিচার করিতে পারিলেই, ক্ষুদ্র জীব সমাধিকালে আপনাকে মহান্ বা [illegible]

উপলব্ধি করিতে পারেন। পারিয়া ঐ অবস্থায় স্থিতিলাভ করেন, ইহাই ধ্যান-যোগ। ইহাতেই সদ্যোমুক্তি হয়।

আমরা আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

সম্পূর্ণ ধর্ম্মের এই যে পাঁচটি অবস্থা বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারাই কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ;—না ইহাদের সমস্ত সাধনাগুলির সাহায্যে তবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণভাবে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায় ?

ব্রহ্মভাবে স্থিতিই ব্রহ্মজ্ঞান। অন্যগুলি সাধনা মাত্র। বিশ্বাসী ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা লাভ করেন, আর ধ্যানযোগী ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা অনুভব করেন,—এই দুই অবস্থা কখন একরূপ হইতে পারে না। বিশ্বাসী ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশ্বাস মাত্র রাখেন ; তিনি আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন না, আত্মভাবে চিরস্থিতি লাভ করিতেও পারেন না। বিশ্বাসীর আত্মানুভব অপেক্ষা, বহিরঙ্গ কর্ম্মীর আত্মদেবের অনুভব অনেক অধিক। তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ অভ্যাসযোগীর জ্ঞান অনেক প্রবল এবং সুখও নিরতিশয়। এতদপেক্ষা জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান অনেক পরিপুষ্ট। আর একমাত্র ধ্যানযোগ দ্বারাই ব্রহ্মভাবে বা আপনি আপনি ভাবে স্থিতি ঘটে। ইহা ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। তাই শ্রুতি বলেন,

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ইতি।

———

দশম কথা।

—— ∞*∞ ——

গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব।

শ্রীগীতার ধর্ম্ম নূতন নহে। ইহা সনাতন ধর্ম্ম। গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা মহাভারতের মত এই স্থানে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম। যাঁহারা বলেন, গীতা মহাভারতের অনেক পরে রচিত হইয়া মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মতটি ভ্রান্ত। আমরা মহাভারত হইতে ইহাও দেখাইতেছি।

গীতোক্ত ধর্ম্মের নাম ঐকান্তিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম নূতন নহে। বহুবার এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, আরও কতবার প্রচারিত হইবে; কে বলিবে? ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। মানবহৃদয়ের কলঙ্কচ্ছায়ায় এই ধর্ম্ম-মুকুর কালে কালে কলঙ্কিত হয় মাত্র। ইহা মানব-হৃদয়ের দোষ, ধর্ম্মের দোষ নহে। শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া আবার এই ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যান।

মহাভারত বলিতেছেন—বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে তাহা আপনার নিকট কহিয়াছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদ-সম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণ-সমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ব্রহ্মা নারায়ণের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ছয় বার উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং এই ছয়বার এই সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। প্রতিপ্রলয়ে এই বিদ্যা নারায়ণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তমবারে নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠদৌহিত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে, মনু

লোকপ্রতিষ্ঠা জন্য স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়ে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। পূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম কীর্ত্তন সময়ে মহারাজ! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। এই সনাতন ধর্ম্ম সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। (শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়, কালীসিংহের অনুবাদ)।

মনুষ্য আপন বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা জগৎকে কখন উন্নত :করিতে পারে নাই পারিবেও না। এই সনাতন-ধর্ম্ম প্রভাবেই জীবের নিঃশ্রেয়স ও জগতের অভ্যুদয় হইবে, অন্ততঃ শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়। ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন— "এই পাপ জগৎ ঐকান্তিকধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত হইলে, হিংসা-পরিশূন্য, সর্ব্বভূত-হিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বারা সত্যযুগ আবির্ভূত হইবে, এবং সমুদায় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকটে এইরূপে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গীতা-পরিচয় শেষ হইল। সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত বিনাশ জন্য শ্রীভগবানের অবতার। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মসংস্থাপনও তাঁহার কার্য্য। ভগবল্লীলায় আমরা প্রথম দুইটি কার্য্য দেখি, শেষটি লইয়াই গীতা। শ্রীগীতা দ্বারা জগতের ধর্ম্ম সংস্থাপন হইয়াছে। জগৎও গীতা-স্থাপিত ধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

উপসংহার।

এস্থানে আমাদের একটু ত্রুটি স্বীকার করিতে হইতেছে।

গীতার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দের অর্থ জন্য মহাপুরুষদিগের ভাষ্য, টীকা ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরির ভাষ্যবিবেচন, মধুসূদনসরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থ-দীপিকা, নীলকণ্ঠসূরিকৃত গীতার্থপ্রকাশ, হনুমদ্ভাষ্য, রামানুজভাষ্য, বলদেবভাষ্য, বিশ্বনাথকৃতটীকা, শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা প্রভৃতি হইতে সংস্কৃত প্রতিশব্দ গুলি গৃহীত। এই সমস্ত মহাত্মার সৎশাস্ত্র-সম্মত মন্তব্যগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে দেওয়া হইয়াছে। অন্যশাস্ত্রগত বিরোধী মতগুলির সমন্বয়েও প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বঙ্গভাষায় যাঁহারা গীতা সম্বন্ধে সৎশাস্ত্রমত যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও দেখা হইয়াছে। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শশধর তর্কচূড়ামণি, নীলকণ্ঠ মজুমদার, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গীতা, আর্য্যমিশনের গীতা, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, গৌরগোবিন্দ সমন্বয় ইত্যাদি পুস্তক হইতেও শিক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা অসম্ভব দাঁড়াইয়াছে।

গীতা বুঝিতে চেষ্টাই লক্ষ্য, এজন্য যিনি মূলে লক্ষ্য রাখিয়া সৎশাস্ত্র অবিরোধে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কথায় কথায় সমস্ত গৃহীতাংশ স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করা হইল।

আর এক কথা—নিজের জন্য এই অনুষ্ঠান হইলেও কেন ইহা প্রকাশ করা হইল? এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পুস্তক প্রকাশ নামের জন্য নহে। প্রকাশের প্রধান কারণ—একটু ভিক্ষা। ভগবান্ প্রসন্ন হও এই লক্ষ্যে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে, ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের প্রসন্নতা প্রায় তুল্য—যদি কোন সাধু মহাত্মা গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন—পূর্ব্ব বিস্মৃতভাব স্মৃতি-পথে উদয় জন্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপাকটাক্ষপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার—যদি মোহমায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন—তখন সাধু মহাত্মার স্মরণ মাত্রে তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগরূক হইবেই। সাধু-কৃপায় ভগবৎ-কৃপালাভ হইবে। ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। বিচার চন্দ্রোদয়—বেদান্ত গ্রন্থ স্তবাদি সহ।
২। ভারতসমর বা গীতাপূর্ব্বাধ্যায়
৩। ভদ্রা—উপন্যাস
৪। সাবিত্রী—তৃতীয় সংস্করণ [যন্ত্রস্থ]
৫। কৈকেয়ী
৬। গীতা প্রথম ষট্‌ক
৭। গীতা দ্বিতীয় ষট্‌ক
৮। গীতা তৃতীয় ষট্‌ক
৯। যোগবাশিষ্ঠ—উৎসব পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে
১০। অধ্যাত্ম রামায়ণ ঐ
১১। শ্রীমৎ ভাগবত ঐ
১২। গীতামাহাত্ম্য ও গীতার শ্লোক ও শব্দ নির্ঘণ্ট উৎসবে শেষ হইয়াছে
১৩। সৎসঙ্গ—উৎসব প্রবন্ধাবলী [প্রস্তুত হইতেছে]
১৪। মনোনিবৃত্তি—উৎসব হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইবে
১৫। শোকশান্তি ঐ ঐ

Opinions of the Press and the Public about.

Sri-gita,

In Three Volumes.

BY

SREEJUT RAMADAYAL MAZUMDAR M, A.

৺কাশীধামের পরমহংস শ্রীমৎপ্রণবানন্দ স্বামী—

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্য নিধি আমায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষ্য টীকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা যা আমার চ'খে পড়েচে,—তোর দয়ার কাছে তাঁদের দয়া আমার অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। তাঁরা সংস্কৃত লিখে আমার বোধের অগম্য করে রেখেচেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরা। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। যত দিন তুমি আমার হাতে "ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম" না দি'চ্চ তত দিন তোমায় দয়াল বল্‌তে আমার জিহ্বা আপনা আপনি সংকোচ হ'চ্চে।

রাম! তোমার দেহটা চির দিনের নয়. এই ভেবে গীতাকে শীঘ্র আমার হাতে দাও—এই আমার বল্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে।

মহারাজা শ্রীকুমুদ চন্দ্র সিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর।

Your edition of গীতা in the উৎসব will be a jewel to the crown of our literature.

Kumud Chand Singha.
Maharaja, Durgapore, Susang.

—:o:—

The Honble Justice Digambar Chatterjee M, A., B, L.,—

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের মত একজন অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ সাধক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করিবার অধিকার বা সামর্থ্য আমাদের মত সাংসারিক লোকের নাই। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে রামদয়াল বাবু আমাদের জন্য গীতার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা সামান্য মাত্র সংস্কৃত ভাষা জানেন, তাঁহারাও স্বল্পায়াসেই এই মহাগ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভাষা ও ভাবের এরূপ বিশদ বিশ্লেষণ ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় এরূপ সমন্বয় এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পাঠকের নানাবিধ সম্ভাবিত সংশয়ের এরূপ সহজবোধ্য সমাধান আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া রামদয়াল বাবু সমগ্র বঙ্গবাসীর বহুল উপকার করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়।
৩ হঙ্গরফোর্ড ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

Roy Gopal Ch. Banerjee M, A, B, L., Bahadoor. Retired Dist & Session Judge—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ননীলাল রায় চৌধুরী
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়! শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা পড়িতেছি, আর মনে হইতেছে যে এমন জিনিস পূর্ব্বে কখন পড়ি নাই। আজ ২০ বৎসরের অধিক আমি শ্রীগীতার নানা ব্যাখ্যা পড়িতেছি; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভাল রকম ব্যুৎপত্তি না থাকায় এবং শাস্ত্রজ্ঞান যৎসামান্য থাকায় এই অমূল্য গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। মজুমদার মহাশয়ের গীতাব্যাখ্যার মত বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আমি দেখি নাই। এই হতভাগ্য দেশে হিন্দু ধর্ম্মের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও কর্ম্ম দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থ যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ একবার পাঠ করেন তবে তাঁহাদের মতিগতি ফিরিবে বলিয়া মনে আশা হয়। অনুগ্রহ করিয়া কি তাঁহারা একবার পড়িবেন? আমি ইহা পড়িয়া বড়ই শান্তি পাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা।

৩১ এ মে ১৯১৪। মোঃ চক্রধরপুর।

Mr. C. S. Sen. Bar-at law—

একটু একটু মনে পড়ে ৺পিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়া একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই, যাহাতে গীতা অনূদিত না হইয়াছে। সভ্যজগতের বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল; এবং এই দুইখানি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু কাশীর 'উৎসব' অফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলকেই হেঁটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ে ভক্তির প্রাখর্য্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবংবিধ অমৃতময় কথা লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান্ লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখন সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন
(ভূ প্রদক্ষিণ প্রণেতা—ব্যারিষ্টার)।

The Honble Late Justice Sarada Charan Mittra M, A, B, L.

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি সুন্দর, অনুবাদের ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসারদা চরণ মিত্র।
গ্রে ষ্ট্রীট।

শোভাবাজারের ৺মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, মহাশয় মান্যবরেষু।

প্রণামনিবেদনমিদং

আপনার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গানুবাদ ও ভাষা সরল ও সুমিষ্ট। গীতার তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্যবোধের সহিত সহজ ভাষায় লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে, অর্থ বঝিতে কষ্ট হয় না। এই গীতা পাঠে দুর্ব্বোধ্য গীতার গূঢ়মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি, যাঁহাদের অদৃষ্ট শুভ তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কার্য্যে আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। জগতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য। গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের সকলেরই পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে)

এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরূপভাবে বঙ্গভাষায় গীতা আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। আপনার বিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল সার্থক হইল। ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৮ সাল।

The Amrita Bazar Patrika

In these days of Gita, unfortunately rather run wild, the compilation of one by Sj R. D. Mozumdar, with its time honored commenraries and interpretations of different annotators from Sankaracharya downwards, along with the author's translations of the same and elaborate elucidation of the texts in his plain healthy and placid Bengali in the form of a dialogue between Sree Krishna and Arjun, is most opportune. It is not a book-seller's book labelled "cheap" with all the modern claptraps to call attention of the public, but the result of life-long devotion of one to the cause of religious literature of Bengal and the embodiment of the realisation of the highest truths involving the difficult problems of Life here and hereafter, which the author being himself a sincere worker in the fields of religion, knows well how to put into the mouth of Arjun and have his queries answered by Sree Krishna. It is really the book of the day —of the month, nay of years to come, far superior to its kind in respect of vast information it affords, of the varied matters it contains and of the light it throws in the way of right understanding of them, and above all of certain spirit of earnestness and faith—a genuine "pious feeling" that he has introduced all along the line to make the abstrusest of subjects, so light, pleasant and interesting a reading. Herein lies the speciality of the book. As a religious book, containing as it does the sublimest of thoughts that Hindu philosophy can conceive of, coupled with the highest practical moral truths that it inculculates, the position of the Gita is very unique. "It is a harmony of the doctrines of Yoga, the Sankhya and Védanta, combining with them the doctrine

of faith in Sree Krishna and of stern devotion to caste rules." The author of the three volumes has fully realised this position and has explained in his masterly way and in the true light of our shastras, the principles underlying the doctrine of Karma, Bhakti and Jnan without entertaining the possibility of the idea that they can be explained in any other way simply to suit the varying fashions and needs of the time. This is his orthodoxy. Sj Ramdayal Mozumdar, though not altogether unknown to the devotees of our religious literature, has, however, no glittering testimonials to present to the eyes of the public. Yet the silent way in which he has worked all along his life, the education he has received and imparted, the strictly religious life he leads and lastly the series of bereavements in life which, to him a blessing in disguise, he has experienced, will sufficiently speak for this monumental work and both the orthodox and modernised sections of our community will, we have no doubt, find within a short compass, food enough to satisfy their religious cravings. The preface he has added to the last volume of his work is highly instructive and no less interesting. It shows the man and the source from which he has drawn his inspiration, as also his resignation to and dependence on the Divine will. And the last concluding lines of the para have a pathos quite in keeping with the true spirit of the Gita.

Amrita Bazar Patrika, 16-12-13.

Prof. Mahendralal Sarkar M. A. Professor of Philosophy, Sanskrit College, Calcutta, writes :—I feel much pleasure in going through the Sri-Gita—an expository work—by Sj. Ramdayal Mazumdar M. A. Editor, the Utsab. It is the master-piece of the author, who has made valuable contributions to Hindu religion, and culture. The author is thoroughly versed in the sacred lore of the Hindus and has realised the same in his life. In his Sri-Gita, he has given a thorough and comprehensive exposition of Adwvitabad of Sankar. Its special feature is that he has embodied his thoughts and arguments in Bengali in the form of dialogues between the Seeker and God himself. By the master-piece of dialectic method he has sought to instil, in the mind of his readers, the meaning and bearing of Adwbitabad and practice (Yoga) of the same in the Hindu thought and culture. This mode of treatment, I think, will be hailed by those, who have an yearning to grasp the problems of the Gita—hence of Hindu life, and the solutions of the same. To me, it is an audacity to write on so sublime a thing as it is.

Aditya Nath Moitra Darshanratna Head Pandit, Jamtara—

To the great delight and emulation of the public and the press Sri Gita—a huge and monumental work by Sj. Ramdayal Majumdar M. A. editor of 'the Utsab' has come out of the press—in three decent volumes. It is the product of profound learning and deep research in the fields of

Eastern Philosophy and Sociology above all of earnest devotion and steady perseverance—not that of a compiler but that of a seeker in the path of realisation and a student of Divine Wisdom for about a quater of a century. It is unique and unprecedened. The general feature of the product is that it is expository and elucidatory in its character, of all the problems of Hindu philosophy—especially the Advaita-bad of Sankara, Bishishta-dvaitabad of Ramanuja, Dvitabad of Kapila, and so forth. The author has brought to bear upon this point his whole effort and energy and throughout the work, he has tried to understand and explain the truth of the Eastern sages divested of the sectarian prejudices and criticisms. To realise this end,—he has given a synthetic commentary (সমন্বয় ভাষ্য) in Sanskrit, culled out of all the commentaries of the Gita, harmonised and synthesised into an organic unity, based on the proper and unprejudiced understanding of the three aspects of higher mind—Yoga, Bhakti, Jnan—in its progress towards the divine wisdom. To this commentary—at once novel and unique—he has added an elucidation of all the problems of the Gita and hence of Hindu Philosophy and culture by a detailed analysis and set forth in the form of dialogues in Bengali a master-piece of the dialectic method of treatment. While he, by one stroke of genius, has synthesised all the conflicting problems of Hindu philosophy and harmonised them into an organic whole, he has added newness and novelty in elucidating each problem, from all the aspects and thus paving the way to proper understanding of Hinduism and its culture.

For all students of Hindu Science of religion and life it is to be a perennial source of interest and attraction.

The Sri-Gita and its adequate and general prefatory treatise—গীতা পরিচয়—Introduction to Gita (second edition) by the same author are the fore-runners of a new era in the history of Hindu Culture. To the fulfilment of this end, they have come and let God be with them in the fulfilment of their mission.

The Bengalee

It gives us great pleasure to accord a very warm welcome to the publication of Srimad Bhagavad Gita by Babu Ramadayal Mazumdar, M.A. The "Bhagavad Gita" is in itself an infinite treasure of the deepest, mightiest and sublimest spiritual wealth that the world has ever conceived or created and as such, it is ever clear and ever welcome to the Indian mind and it is but in the fitness of thing that a man like Babu Ramdyal Mazumdar should take upon himself the difficult and delicate task of editing the Gita with his own expositions. The author is known to us all, as an expert educationist, as the editor of the monthly magazine Utsab and also the author of such well known books in the Bengali literature as "Bhadra," Sabirti" etc.

The lucid, and exhaustive exposition that the author has added to the book and which indeed has given a special interest and value to the present publication are the outcome of the author's best labours and deepst meditation for 20 long years of his life and this fact alone has given an additional charm to the book. The author has also taken pains to include in his publication all the different commentaries together with easy Bengali translations of the same. His interpretation of the Gita in regard to "Barnasram Dharma" is quite original. Another special feature of his book which has drawn our attention is that under the garb of dialogues he has attempted to explain the most intricate passages and ideas of the text supporting himself at almost every step by references from the ancient Shastras. And lastly we find the whole of the Yoga Basista Gita appended to it with the author's lucid and happy method of elucidation. These, we are sure, will enable each and every reader to grasp the inner spirit and import of the Gita. We may mention here also that the get up of the book is quite attractive and excellent and the price reasonably moderate. The book will be had at 162, Bowbazar Street in 3 volumes—vol. I price Rs. 4-4-0 ; vol. II price Rs. 4-4-0 ; vol. III price Rs. 4-4-0. They can be had separately. The Bengalee, 9-1-14.

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ।

সমস্ত গীতা-সমুদ্র এই পুস্তকে মথিত হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অপূর্ব্ব গীতা ভাষ্য যখন খণ্ডে খণ্ডে উৎসব পত্রিকায় * * * সাধারণ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে এই সকল জিনিষের এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

বঙ্গবাসী। ৫ই পৌষ, ১৩২০ সাল।

চিরপবিত্র গীতার নাম শুনিলে আজ কাল সহসা শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? গীতা যে কি বহুমূল্য রত্ন, সাধক-ভক্ত তাহা বুঝেন। প্রকৃত গুরুর নিকট গীতার পাঠ গ্রহণ করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই গীতার মাহাত্ম্য বুঝেন; পরন্তু ভগবানই বলিয়াছেন,—

"যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥"

"যেখানে গীতার বিচার হয়, পাঠ, অধ্যাপনা হয় এবং শ্রবণ হয়, হে পৃথ্বি! নিশ্চয়ই আমি সেখানে সর্ব্বদা বাস করি।"

এহেন গীতার নাম শ্রবণে অধুনা শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? আজ কাল পথে ঘাটে মাঠে অন্দরে বাহিরে স্কুলে কলেজে পকেটে বগলে সর্ব্বত্রই গীতার ছড়াছড়ি। ইহাতে অবশ্য বুঝিতে হয়, গীতার মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহা? না, তাহা নহে; পরন্তু গীতার মাহাত্ম্য ডুবিতেছে। অধুনা বহু ক্ষেত্রে অনধিকারীর হাতে গীতার অনুশীলন হইয়া

থাকে। অনেক স্কুল কলেজের ছেলেরা গীতা পড়ে। গীতার মর্ম্ম সবাই কি বুঝেন? সকল ছেলেরা কি যথারীতি গুরুর নিকট গীতা শিক্ষা পায়? অধুনা অনধিকারীর গীতাচর্চ্চা ফলে আমাদের রাজপক্ষের অনেকেই শঙ্কিত হন; পরন্তু কদর্থে বা সদ্ভাবে তাঁহাদের অনেকেই ভাবেন, গীতার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে "সিডিসনের" বীজাণু বিজবিজ করিতেছে।

দেশের দুরদৃষ্টে অধুনা অনেক ক্ষেত্রেই অনধিকারীর অনুশীলনে গীতা বিকৃতার্থে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে গীতাচর্চ্চার প্রকৃত অধিকারী অধুনা বিরল। মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত গীতালোচক ভগবানের প্রিয়। ভগবান্ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।"

এমন গীতালোচক এখন কয় জন? বড় সৌভাগ্যে এরূপ গীতালোচক পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর আমরা এইরূপ একটি গীতালোচক পাইয়াছি। ইনি শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার। মজুমদার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতের কাছে ইহার কিরূপ গৌরব, তাহা অবশ্য বুঝাইতে হইবে না; কিন্তু ইংরেজি বিদ্যার জন্য সংসারের পবিত্র পীঠে তাঁহার উচ্চ স্থান নহে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান; পরন্তু বহু শাস্ত্রাধ্যায়ী শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্র মতে শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থার পোষক ও পালক। তিনি শাস্ত্রানুসারে আচারাদিপূত ও নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। প্রকৃত গুরুর নিকট তিনি গীতার উপদেশ পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি ভগবদ্ভক্ত। তিনি গীতার সদুপদেশ পাইয়া আপনার উজ্জ্বল ধীর বুদ্ধির প্রভাবে গীতাধর্ম্মের গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটনে এবং আধ্যাত্মিক দার্শনিক ভাবোদ্ভাসনে সত্যই সামর্থ্যবান্ হইয়াছেন। তিনি গীতার মর্ম্ম বুঝেন এবং গীতার বহু টীকা-ভাষ্যের গূঢ়তত্ত্ব জানেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তি। তিনি জ্ঞানী ও ভক্ত। এ কল্মষময় কলিযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যে ভাবে ধর্ম্মের ভাব প্রচার করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাহার উপর তিনি সরল সহজ মার্জ্জিত বিশুদ্ধ বোধগম্য ভাষায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারবিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁহার রচিত সাবিত্রী ও ভদ্রা, কৈকেয়ী ও ভারত সমর, বিচার চন্দ্রোদয় যখন পড়ি, তখন অবসাদে প্রফুল্লতার বিদ্যুদ্দাম ফুটিয়া উঠে। তখন মনে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যে এখনও ধর্ম্ম আছে এবং ধার্ম্মিক আছেন।

বহু বৎসর ধরিয়া মজুমদার মহাশয় গীতার আলোচনা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তাঁহার গীতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুই খণ্ড পাইয়াছিলাম। এবার তৃতীয় খণ্ড পাইলাম। ইহাতে গীতার শেষ। কি অপূর্ব্ব রত্ন পাইলাম। বঙ্গভূমি এবং বঙ্গসাহিত্য আজ ধন্য হইল। এমন সুন্দর গীতার আর সংস্করণ আর কৈ? সুদৃঢ় সাধনায় মজুমদার মহাশয়ের চিত্তমূলে যে অপূর্ব্ব ভাব নিহিত, তাঁহার গীতায় তাহা স্বভাবজ সুন্দর ভাষায় প্রকটিত।

তিনি গীতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রথম অন্বয়মুখে ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন, আনন্দগিরি, বলদেব প্রভৃতি টীকাকারের মত সঙ্কলন করিয়া সংস্কৃত ব্যাখ্যাটিকে এরূপ সর্ব্বতোমুখী করিয়াছেন যে এই একটি মাত্র টীকা প্রশ্নোত্তর সহ পাঠ করিলে সকল টীকা পড়িবার ফল লাভ হয়। তৎপরে সরল বঙ্গানুবাদ এবং সবিশেষ সুবৃহৎ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন প্রশ্নোত্তর ছলে ধর্ম্ম ও সাধন বিষয়ক যাবতীয় সংশয়ের অপনোদনার্থে যে প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ত্তমান সময়ে এত বহুল যে, উহার অপনোদন ভিন্ন হিন্দুর কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না এবং দার্শনিক মত সমূহের সামঞ্জস্য হয় না; এমনকি সাধনাতেও সজীবতা ও সরলতা আসে না। মজুমদার মহাশয়ের অদ্ভুত সাধন মহিমা ও লিপিকৌশলে এই প্রশ্নসমূহ এমন ভাবে নিরাকৃত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিলে গীতার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা কাব্যরসে চিত্ত ডুবাইয়া দিয়া অনায়াসে ভগবদ্ভক্তি ও বেদান্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাহেন, ভারতীয় কর্ম্মের জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা গীতার এই অমূল্য রাজ সংস্করণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ধন্য মজুমদার মহাশয়! গ্রন্থের অন্তর্বহিঃ সুন্দর। তিন খণ্ডে গ্রন্থ

সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৪৷ চারি টাকা চারি আনা মাত্র। তিন খণ্ডে সমাপ্ত। কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রিটে উৎসব আফিসে প্রাপ্তব্য।

বসুমতী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় হিন্দুধর্ম্মের সার উপদেশ অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই গ্রন্থখানির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। মহাভারত পঞ্চম বেদ। যাঁহারা বেদে অনধিকারী, তাঁহাদের জন্যই ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। গীতা সেই মহাভারতের উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড। অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।"—এই ব্যাসোক্ত উপনিষদে সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন যোগই সুন্দরভাবে বিবৃত। কিন্তু আজকাল আমরা বুদ্ধির দোষে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া থাকি। আজকাল অনেকের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় গীতা দুষ্ট হইয়া পড়িতেছে,—আর লোক সেই ব্যাখ্যা পড়িয়া বিপথগামী হইতেছে। এই দুঃসময়ে আমরা শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহাতে মূল আছে, সারসংগ্রহ সংস্কৃত টীকা আছে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ আছে,—আর আছে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শেষোক্ত ব্যাপারই মনস্বী রামদয়ালবাবুর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সংস্কৃত টীকায় শঙ্করাচার্য্য. শ্রীধরস্বামী মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বলদেব বিদ্যাভূষণ, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ, হনুমৎস্বামী, যামুনাচার্য্যের ভাষ্য ও টীকার সারাংশ চয়ন করিয়া রামদয়াল বাবু এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন। অন্বয়টি ঐরূপ কশি টানিয়া না দিয়া স্বতন্ত্রভাবে দিলে অনেক পাঠকের সুবিধা হইত। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে রামদয়াল বাবু ঐরূপই ব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গানুবাদ বেশ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নানা শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মজুমদার মহাশয় প্রত্যেক শ্লোকের যে তাৎপর্য্য প্রদান করিয়াছেন,—তাহাই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। ইহাতে নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রকার আপত্তিরই নিরসন করা হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরই এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠকরা কর্ত্তব্য। এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি; কেবল উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবে খোস্‌খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে চলিবে না। রীতিমত মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ করিলে তবে ইহার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হইবে। গীতা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত সহজ নহে, বালকেরও কার্য্য নহে। ইহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে অনন্যমনে ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্য আত্মনিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ইহা পাঠ করিতে হয়। রামদয়াল বাবু সেই পথটি অত্যন্ত সুগম করিয়া দিয়াছেন। অর্জ্জুন নানাবিধ আপত্তি উপস্থিত করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন ভগবান্ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ তুলিয়া সেই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন,—ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। আমরা হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রকেই এই অমূল্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রামদয়ালবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। ইহা ভিন্ন তিনি হিন্দু শাস্ত্র পাঠে এখন বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। সুতরাং তাঁহার গীতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা যে সুন্দর হইয়াছে,—তাহা বলাই বাহুল্য। এই গীতা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার প্রতিখণ্ডের মূল্য ৪৷০

২

টাকা। অনেকের এই মূল্য অধিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহারই ঐ অমূল্য গ্রন্থের তুলনায় এই মূল্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিবেন। এই গ্রন্থ হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান উৎসব অফিস ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। বসুমতী। ৪ঠা মাঘ, সন ১৩২০

গ্রন্থকার প্রণীত কেকয়ী।

বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্, এ, মহোদয় প্রণীত "কেকয়ী" পাঠ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। গ্রন্থকার উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, শাস্ত্রচর্চ্চা নিরত, কর্ম্মবীর ও সাধক। সেই জন্য তাঁহার সকল গ্রন্থেই ঐ সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেই জন্যই সুধীসমাজে তাঁহার গ্রন্থের সমাদরও অধিক। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে নূতনত্ব আছে। সে নূতনত্ব, শাস্ত্রানুগত, যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মভাব-উদ্দীপক। কেকয়ীচরিত্রও সেইরূপেই অঙ্কিত। বাল্মীকির বর্ণনায় বহির্দৃষ্টিতে যে কেকয়ী সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন, রামদয়াল বাবুর অন্তর্দৃষ্টিতে সেই কেকয়ী সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। সঙ্গদোষে মানুষের স্বভাব কিরূপে কলুষিত হয়, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের ফলে সেই মানুষই আবার কিরূপে সন্মার্গগামী হইয়া ভগবৎ-কৃপালাভে সমর্থ হয়, কেকয়ী-চরিত্রই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কেকয়ী চিরকাল রামচন্দ্রকে আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায়—বোধ হয় তদপেক্ষাও অধিক—ভাল বাসিতেন। কিন্তু নীচবংশজা নীচপ্রকৃতি মন্থরার সংসর্গে, তারই পরামর্শে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার মতির পরিবর্ত্তন হইল—তিনি কুমতি-পরিচালিত হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে বাধা দিয়া তাঁহাকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য—প্রাণে মারিবার জন্য—হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বনে পাঠাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন,—উচ্চবংশসম্ভূতা হইয়াও নীচ প্রবৃত্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন। তৎপরে সাধু-চরিত্র স্বীয় গর্ভজাত ভরতের তিরস্কারে, তাঁহার উপদেশে ক্ষণমাত্রেই তিনি আত্মাপরাধ বুঝিতে পারিলেন, যার পর নাই অনুতপ্ত হইলেন, সেই অনুতাপে ব্যাকুল হইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের সহিত নিজেই বন পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র যখন কিছুতেই ফিরিলেন না, তখন তিনি অগত্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই চৌদ্দ বৎসর যার পর নাই অসুখে ও অশান্তিতে কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপ অনুতাপের এইরূপ ব্যাকুলতার ফলে ঈশ্বরাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি এরূপ কৃপা প্রদর্শন করিলেন যে, চৌদ্দ বৎসরের পর বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আপন জননী কৌশল্যাকে প্রণাম করিবার অগ্রে কেকয়ীকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কৃতার্থ করিলেন। রামদয়াল বাবুর "কেকয়ী"তে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক মনে করি। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এতই আনন্দ বোধ হইল যে, সেই আনন্দের বশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এত কথা লিখিলাম। মূল্য ।০ ১৬২ নং বৌবাজার উৎসব আফিসে প্রাপ্তব্য ইতি।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

শিবপুর।

গ্রন্থকার প্রণীত ভদ্রা।

১৩১৯ অগ্রহায়ণের গৃহস্থে প্রকাশিত শ্রীআদিত্যনাথমৈত্র দর্শনরত্নের 'ভদ্রা'নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

"ভদ্রা'র রুচি মার্জ্জিত। ভদ্রার চরিত্র বিশ্লেষণ, চরিত্রসজ্জা-প্রণালী সুদক্ষ নাটককারের মোহন অঙ্গুলীর পরিচায়ক। ... ... ইহার সাগরের বর্ণনা আকাশের বর্ণনা অতি মধুর। .. ... 'ভদ্রার' লক্ষ্য উৎসর্গ পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভদ্রা'র লক্ষ্যবিধির উপায়ভূত সাধনরহস্য পরিশিষ্টে প্রকটিত। লেখক সংযম ও সাধনার প্রকট মূর্ত্তি সমাজের সম্মুখে ধারণের নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণ, ভদ্রা ও অর্জ্জুনের মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়াছেন। ... ... বিবাহ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পশুবৃত্তির পূর্ণাহুতির জন্য নহে। বিবাহে যে অনুরাগের সূত্রপাত হয়, তাহাই ক্রমশঃ ভগবৎপ্রেম-মহার্ণবে পরিণত হয়—ইহাই 'ভদ্রা'র ইঙ্গিত। ... ভদ্রার পরিশিষ্টই ভদ্রা-জীবনের গৌরব ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। ভদ্রার পরিশিষ্টই এই পুস্তকের জীবন। 'ভদ্রা'র সাজসজ্জা এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যই। ইহাতে লেখক সমগ্র হিন্দুসাধনতত্ত্ব বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পতি-নারায়ণ-ব্রত উদ্যাপন করিতে হইলে, সাধ্বী স্ত্রী যে ক্রম অবলম্বন করিবেন—তাহা বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ... ... সর্ব্বোপরি গীতাতে যে সার্ব্বজনীন অসাম্প্রদায়িক বিলেপশূন্য ধর্ম্মের সনাতন শাশ্বত ছবি ও "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" সাধন-পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ... ... বর্ত্তমান কালে সভ্যতার চশমা পরিয়া আমরা যে বিকৃতি, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার গহ্বরে পতিত হইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'ভদ্রা' যে আশ্বাস লইয়া আসিয়াছেন—তাহা পরিপূর্ণ হইয়া প্রতিগৃহে পতি-নারায়ণ-ব্রত উদ্‌যাপিত হউক,—প্রতিজীবের অসীমের প্রতি পিপাসা জাগ্রত হইয়া ভারত-সমাজকে সকল প্রকার দূষিত বায়ু হইতে রক্ষা করুক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

গ্রন্থকার সম্পাদিত উৎসব মাসিক পত্রের সমালোচনা।

বঙ্গবাসী—২০ শ্রাবণ ১৩১৯

উৎসব। ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়; ১৩১৯ সাল। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ননীলাল রায়চৌধুরী। কলিকাতা, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, উৎসব কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৷৹ দেড় টাকা প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ চারি আনা। এইবার এই কয়টী বিষয় আছে,—সংসার মায়া; অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান ও কর্ম্মফলত্যাগ; শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে; ধর্ম্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠা: এস দীন দয়াময়, ৺কাশীধাম; সংসারচক্র নিবৃত্তি বা মোহনিবৃত্তি; ভয় ও অভয়; শ্লোকনির্ঘণ্ট; ঋগ্বেদ সংহিতা; অধ্যাত্ম রামায়ণ। "সংসার মায়া" প্রবন্ধে গাধিনন্দন ব্রাহ্মণের চরিত্র চর্চ্চায় মায়ার খেলার ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। এ প্রবন্ধের শেষাংশ এই—"তমঃসঙ্কল্প লইয়া থাক, তুমি কীট পতঙ্গাদি হইয়া যাইবে। রজঃসঙ্কল্প লইয়া থাক, আবার মানুষজন্ম হইবে। সত্ত্বসঙ্কল্প কর, মোক্ষ সাম্রাজ্য তোমার অদূরে। এই সমস্ত কল্পনা ত্যাগ কর এই জীবনেই তোমার মুক্তি।" "অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্মফলত্যাগ" প্রবন্ধে কর্ম্মফলত্যাগের কথা অল্পের মধ্যে বুঝান আছে। এরূপ ভাবের কথা বাঙ্গলা সাহিত্যে অবশ্য নূতন নহে; তবে আমাদের ন্যায়শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

জীব পাছে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয় বলিয়া জীবকে স্মরণ করিয়া দিবার জন্য বেদেও কোন কোন বিষয়ের একাধিকবার উল্লেখ আছে। তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে না। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আছে,—"নাম অভ্যাস অপেক্ষা নামের জ্ঞান ভাল; নামের জ্ঞান অপেক্ষা নাম লইয়া ধ্যান ভাল; অজ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপ্রীতি জন্য কর্ম্ম করা ভাল।" ধ্যানের কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলা উচিত ছিল। তাহা হইলে ইহা সাধারণের সহজে হৃদ্গত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়। উপনিষদে ধ্যানের কথাটা যে ভাবে বুঝান হইয়াছে, সেই ভাব সহজ বাঙ্গালায় আসিলে, সাধারণের সুগম হইবারই কথা নহে কি? অন্যজ্ঞান দ্বারা প্রতিহত না হইয়া স্থির দীপশিখার ন্যায় যে জ্ঞান অনাহত, তাহাই ধ্যান এইটুকু ভাল করিয়া বুঝাইলে, ধ্যানের ভাব সহজে আনে, তার পর ফলত্যাগের কথাটা আরও সহজ হইয়া আসিতে পারে।' "৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন" কবিতাটীতে ভক্তের দৈন্যভাব বেশ প্রস্ফুট। ছন্দ ও ভাব মিষ্ট। "ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধটী অবশ্য পাঠ্য। "এস দীন-দয়াময়" কবিতা ভক্তিভাবে পূর্ণ।

"আমি অভিমানে, বলি কত কথা,
অপরাধ তুমি নিও না;
এমন করিয়া স্নেহের নয়নে,
কেহ ত আমায় দেখে না।
(আমি) এই ছুঁই ছুঁই যুগল চরণে;
মাথা রেখে বলি এস না।
নয়নের জলে পথ যে ভিজাই
পাছে পদে লাগে বেদনা।"

ভক্ত ভাবুক কবি নহিলে কি এমন কথা বাহির হয়। অধুনা হেঁয়ালি-প্লাবিত বঙ্গীয় সাহিত্যে এমন ভক্তিপূর্ণ কবিতা বিরল নহে কি? ভক্তিভাজনের ভক্তের, সমবেদনার কবি অনেক হইতেছে, কিন্তু এমন ভক্ত কয় জন এই জন্যই ত "উৎসব" কে ভাল বাসি। কোন্ হিন্দুই না ভাল বাসিবে? অধিকাংশ মাসিকপত্র হিন্দুয়ানির ভাণে বাবুত্বেরই ভাব প্রচার করে। অন্যান্য বিষয়গুলি হিন্দু লেখক সম্পাদকেরও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছে। "৺কাশীধাম প্রবন্ধে" কাশীর বর্ণনা নহে, গল্প নহে; গল্পের ভাষায় জীবপরিণতির পরম তত্ত্ব।

বসুমতী।

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২০ সাল।

উৎসব। মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার এম এ সম্পাদিত। ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুত ননীলাল রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

উৎসব ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্র। ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক সার কথার আলোচনা থাকে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রে ও হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি অতি সুন্দর ও সরল ভাবে ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সার কথার আলোচনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ মাসিক পত্র আর নাই। ইহা সকলেরই পড়া উচিত। তবে আমরা একটা বলিতে চাহি যে, ইহাতে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অধিক আলোচনা থাকে,—সমাজ, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় না। অন্ততঃ বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সাত সংখ্যায় আমরা উহা দেখিলাম না।

মেদিনীপুর-হিতৈষী।

শ্রাবণ ১৩১৯ সাল।

উৎসব—আষাঢ় ১৩১৯। ঠিকানা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। সম্পাদক—ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম এ। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করি। এই প্রকার মাসিকের রীতিমত পাঠক হইলে তবে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম—অর্থ—কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যদি মানুষ হইতে চাও, যদি কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে চাও, যদি প্রকৃত প্রেম লাভ করিয়া চিদানন্দে বিভোর হইতে এবং জীবন 'নিতুই-নব' উৎসবময় করিতে চাও—তবে উৎসবের গ্রাহক হও।

হিতবাদী।

২৮ কার্ত্তিক ১৩২০ সাল।

উৎসব। ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৩২০ সাল। উৎসবের সম্পাদক শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার এম এ। প্রত্যেক প্রবন্ধ গভীর ভাবদ্যোতক। আমরা উৎসব পড়িয়া হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ বোধ করিতেছি। যোগবাশিষ্ঠ ও গীতার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইতেছে। প্রতিভাবান বঙ্কিম বাবু গীতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীযুত রামদয়াল বাবুর গীতা সম্পূর্ণ হইলে আমাদের কেবল যে সে দুঃখ দূর হইবে এমন নহে,—আমরা আশাতীত কল্পনাতীত আনন্দ লাভের অধিকারী হইব। ভগবান রামদয়াল বাবুকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে সহায় হউন এই প্রার্থনা।

গ্রন্থকার প্রণীত—

ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়।

ডিমাই ৮ পেজী প্রায় ৪০ ফর্ম্মায় অনূন ৩০০ পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ।
মূল্য ২৲ টাকা।

বঙ্গবাসী বলেন—"ভারত সমর" শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, লিখিত। সুললিত গল্পচ্ছলে মহাভারতীয় কথা এমন সুন্দর করিয়া লিখিতে পারেন এমন লোক দেখি নাই। প্রবন্ধ ক্রমশঃ চলিতেছে, সম্পূর্ণ হইলে একটী নূতন জিনিষ হইবে। ... "ভারত সমর" প্রবন্ধে মহাভারতেরই কথা প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। আলোচনা টুকু বেশ হইতেছে।"

অর্চ্চনা,—জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, 'ভারত সমরের প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। রামদয়াল বাবু পণ্ডিত এবং জ্ঞানী উভয়ই, তাঁহার এই সন্দর্ভটি তাঁহার চিন্তার গতি নির্ণয় করিতেছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার বলেন—"ভারত সমর" প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য।

রত্নাকর বলেন—"ভারত সমর" নামক পৌরাণিক প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদারের লেখনীপ্রসূত। রামদয়াল বাবুর লেখনীর গুণে গল্পটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে বাবু রামদয়াল মজুমদারের ভারতসমর" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

টেলিগ্রাফ বলেন—Babu Ramdoyal Majumder's 'Bharat; Samar is highly appreciative.

শ্রী

গ্রন্থকার প্রণীত—

গীতা-পরিচয় প্রথম সংস্করণের সমালোচনা।

বঙ্গবাসী (১২।৪।১২) বলেন—গীতার বিশেষত্ব, গীতার শক্তিসঞ্চার, গীতার স্থূল পরিচয়, গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত, গীতার কর্ম্মসঙ্কেত, গীতার স্থান কাল পাত্র,—পুস্তকে এই ছয়টী প্রবন্ধ আছে। রামদয়াল বাবু কৃতবিদ্য ও প্রগাঢ় দার্শনিক; পাশ্চাত্য ও আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। গীতার তিনি যে দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। আজ কাল দেখিতে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অধিকাংশ দার্শনিক লেখকগণ আর্য্য ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বসিলেই, প্লেটো, আরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনসার মার্টিনো পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণকে আসরে না নামাইয়া ছাড়েন না। পাশ্চাত্য-দর্শনের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বা খণ্ডন হউক বা না হউক, পাশ্চাত্য দর্শনের ভূরি ভূরি অনাবশ্যকীয় মত উদ্ধৃত করিতেই হইবে। রামদয়াল বাবুর "গীতা-পরিচয়" গ্রন্থে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই দেখিয়া আমরা সুখী; পরন্তু ইহা রামদয়াল বাবুর একান্ত ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও শাস্ত্রভক্তিরই ফল। রামদয়াল বাবু প্রগাঢ় দার্শনিক হইলেও তিনি যে একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, আলোচ্য পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—'পুস্তক প্রকাশ নামের জন্য নহে, প্রকাশের প্রধান কারণ—একটু ভিক্ষা। ভগবান্ প্রসন্ন হও' এই লক্ষ্যে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের প্রসন্নতা প্রায় তুল্য,—যদি কোন সাধু মহাত্মা গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন। পূর্ব্ববিস্মৃত ভাব স্মৃতিপথে উদয় জন্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপাকটাক্ষপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার গ্রন্থকারকে স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার—যদি মোহমায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন—সাধু মহাত্মার স্মরণমাত্রে হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগরূক দেখিবেনই। সাধু-কৃপায় ভগবৎ-কৃপা লাভ হইবে। ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা।" হিন্দু-শাস্ত্র ও গীতা হইতে বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া রামদয়াল বাবু গীতা শাস্ত্র সরল ও সহজবোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রচনাও প্রাঞ্জল ও অতিশয়োক্তি-বিহীন। বহু অসার উপন্যাস গল্প ও কবিতায় বাঙ্গালা ভাষা এখন কণ্টকাকীর্ণ। ভাষার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী কি এই মহাগ্রন্থের সম্যক্ আদর করিতে পারিবে? ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিমাত্রকেই এই পুস্তক একবার নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

শ্রীকেশবলাল গুপ্ত এম্, এ, বি, এল।

গ্রন্থারম্ভে প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন—"গ্রন্থকারের সেই হৃদয়-রত্নগুলি আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম—'গীতা-পরিচয়" তাহারই অংশ মাত্র।" পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে এ কথাটা কেহ আগ্রহের সহিত পাঠ করেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু 'গীতা-পরিচয়" পাঠ করিবার পর উপরোদ্ধৃত আশ্বাস-বাণী পাঠকের হৃদয়ে বল আনয়ন করে, তাহার হৃদয় আশায় পূর্ণ করিয়া দেয়। এই অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ, সরল বাক্যে বর্ণিত গূঢ়তত্ত্ব আরও শুনিতে পাইব এ আশ্বাসবাণী বড়ই শান্তিপ্রদ, বড়ই আশাবর্দ্ধক।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবুর পরিচয় "অর্চ্চনা" পাঠকের নিকট অনাবশ্যক। তাঁহার বাক্যামৃত প্রতি মাসেই অর্চ্চনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে! ইংরাজী বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশী শাস্ত্রাদি লইয়া পরিশ্রম করিলে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত জীবন যাপন করিলে, আর্য্যসন্তানের কিরূপ দিব্যজ্ঞান জন্মে "গীতা-পরিচয়" পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। পুস্তক পাঠকালে মনে হয় এ লেখা সামান্য রামদয়াল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত সর্ব্বনরনারী-বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তির বাক্য, লেখক ব্রাহ্মণ উপলক্ষ্য মাত্র।

গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক কূটতর্ক-সমন্বিত শাস্ত্রগ্রন্থ বলিলে আজ কাল আমাদের যুবকদের নিকট একটা ভীতিপ্রদ সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। "গীতা-পরিচয়" ও ঐ শ্রেণীর শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে, সমাসান্ত শব্দ আছে তথাপি ইহার সরলতা, ইহার মাধুরী বর্ণনা করা দুরূহ। গীতা-পরিচয় শুধু পণ্ডিতের জন্য নহে, ইহা পাঠে সকল শ্রেণীরই পাঠক সুখ ও তত্ত্বলাভ করিতে পারে, হৃদয়ের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতে পারে। এত বড় দুরূহ বিষয় এত সাদা কথায় বুঝাইয়া দেওয়া সামান্য কৃতিত্ব নহে।

গীতা-পরিচয় আট অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। মঙ্গলাচরণ ২। উৎসর্গ ৩। গীতার বিশেষত্ব ৪। গীতায় শক্তিসঞ্চার। ৫। গীতার স্থূল পরিচয় ৬। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত ৭। গীতার কর্ম্মসঙ্কেত ৮। গীতার স্থান, কাল, পাত্র।

লেখক কেবল গ্রন্থকর্ত্তা নহেন। তিনি সাধক যোগী। যোগবলে মানসচক্ষে যেমন যেমন তত্ত্ব দেখিয়াছেন, তিনি তেমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ গ্রন্থকারের রচনাশিল্প আশ্রয় করিলে তিনি প্রথমে "গীতার স্থূল পরিচয়" দিতেন, তাহার পর "গীতার স্থান কাল পাত্র" নির্দ্দেশ করিতেন পরে গ্রন্থমধ্যে অন্যান্য অধ্যায় সন্নিবেশিত করিতেন। লেখক সামান্য গ্রন্থকার হইলে আমরা অধ্যায়গুলির এরূপ বিপর্য্যয়কে দূষণীয় বলিতাম। রামদয়াল বাবুর পক্ষে এদোষ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।

গ্রন্থকারের সকলই আধ্যাত্মিক, তাঁহার গ্রন্থোৎসর্গেও সাধনার পরিচয় পাই। লেখক বলিয়াছেন—

"হে গুরো! হে মহাদেব আলিঙ্গিত মহাদেবি! হে সর্ব্ব নরনারী-বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তে!" এই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-স্তবক তুমিই—উৎসর্গও তোমাকেই করা হইল।" কি স্বর্গীয় কামনা! কি স্বর্গীয় বৃত্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকার তাঁহারই শক্তিতে বলীয়ান হইয়া শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশ প্রণয়ন করুন।

গীতা-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভাই,—

যে বস্তুটি যাহার হৃদয়ের ধন, তাহার মূল্য তিনিই সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন। তাই অনন্ত করুণানিধান, অনন্ত জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, স্থাবর জঙ্গম—সজীব নির্জ্জীব—সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে "সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" শ্রীভগবান—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগীতার প্রকৃত মূল্যের অবধারণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবদুক্ত এই মহা বাক্যটিরই যে মূল্য কত, তাহা অবধারণ করিবার লোক কোথা? তবে যে মহাত্মা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন—ভিতরে বাহিরে—আশে পাশে—সর্ব্বত্র সেই সুন্দরাদপি সুন্দর তদীয় প্রেমময় মূর্ত্তি সন্দর্শনে অনুক্ষণ কৃতার্থ হইতেছেন, তিনিই উক্ত বাণীর মূল্য বুঝেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণের প্রাণ, সারাৎসার, গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ শ্রীভগবানের হৃদয়বিহারিণী শ্রীগীতার মূল্যেরও পরিচয় পাইয়াছেন। পরন্তু যিনি যতটুকু তদীয় অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তিনি ততটুকু পরিচয় পাইয়াছেন—তাই ঋষি বলিতেছেন—কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ স্বয়ম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ।

প্রবাদ আছে:—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্ভিল্লস্য পত্নী মুদা।

আদায়াথ করেণ গুরুকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহৌ:
অস্থানে পততাং ভবেদ্ধি মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ ॥

যাঁহারা রত্নবণিক, তাঁহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা মণি চিনেন—সুতরাং প্রাপ্তিমাত্র পরম সমাদরে তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। শ্রীগীতা কৌস্তুভ মণি অপেক্ষাও মূল্যবান্; তাই, শ্রীভগবান্ উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন—আর গীতা তাঁহার হৃদয়। একটি বাহিরের—অপরটি ভিতরের। পাছে শ্রীগীতা ভিল্লপত্নীর হস্তে গজমুক্তার ন্যায় অপাত্রের হস্তে বিড়ম্বনা ভোগ করেন, এই আশঙ্কায় তোমার এই প্রয়াস। তোমার এই প্রয়াস কাদৃশ সাফল্য লাভ করিয়াছে, যাঁহারা "গীতা পরিচয়" পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন।

ঈদৃশ সদনুষ্ঠান যতই হয়, দেশের—ধর্ম্মের—সমাজের ততই মঙ্গল। অধুনা আমাদের মাতৃভূমি দিন দিন শ্রীগীতার অনুশীলনে ধন্য হইতেছেন। বঙ্গমাতার কৃতী সুসন্তানগণের অনেকেই অভিনব পরিচ্ছদে শ্রীগীতাকে সুশোভিত করিতেছেন। কিন্তু শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দানে এপর্য্যন্ত কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, আমি অবগত নহি। এই প্রকার পুস্তক যে দুই একখানি দেখি নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমার বোধ হয়, তুমিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ—আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তুমি ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছ এবং যাঁহারা গীতার অনুশীলনে আনন্দ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছ। অতএব তুমি ধন্য—তোমার জীবন সার্থক।

যে গ্রন্থ ভগবানের অতি আদরের বস্তু,—যাহা যোগীদিগের কণ্ঠহার—যাহা গৃহীদিগের চরিত্র-প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি—যাহা গৃহমেধিগণেরও মোক্ষপ্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক—যাহা দেশকাল-পাত্র, সমাজ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও নীতির অদ্বিতীয় শিক্ষক—সেই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষপ্রদ শ্রীগীতার পরিচয় সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। তোমার "গীতাপরিচয়" খানি ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে শ্রীগীতার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বোধ তত্ত্বগুলি যে বহুপরিমাণে সুখবোধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি শ্রীগীতা অধ্যয়ন করিতে চাহেন তিনি তোমার এই "গীতা পরিচয়" হইতে যে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তোমার দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার সাধনার ফলে আজ গীতা পাঠার্থী পবিত্রচেতা সাধুগণ মহোপকার লাভ করিলেন—ইহা অল্পসৌভাগ্যের বিষয় নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।